এম, এ, মোহাইমেন

ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর

ঢাকা–আগরতলা–মুজিবনগর

প্রথম খণ্ড

মোঃ আবদুল মোহাইমেন

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স
২, ডি আই টি অ্যাভেনিউ,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ২৩১৫৯১

স্বত্ব ঃ লেখক কত্‌ক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল ঃ ফাল্গুন, ১৩৯৫ বাংলা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং

প্রচ্ছদ ঃ কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণে ঃ দি ওরিয়েন্ট প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং ওয়ার্কস
২১৮/১ টয়েনবি সারকুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Dhaka - Agartala - Muzibnagar
written by M. A. Mohaimen

Price ঃ Taka Sixty only.
$ 5

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

জনাব আবদুল মোহাইমেন ১৯২১ সনের নভেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় শুলাখালী গ্রামে নানার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নিবাস হলো লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত নুরুল্লাপুর গ্রামে। তার পিতা ছিলেন মরহুম আবদুল মতিন বি,এ, বিটি—যিনি নোয়াখালী জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে ১৯৪৭ সনে অবসর গ্রহণ করেন। জনাব আবদুল মোহাইমেন চট্টগ্রাম মুসলিম হাই-স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে আই,এ, পাশ করে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৩ সনে বি,এ, পাশ করেন। কোলকাতা থাকার সময় মাঝে মাঝে তিনি আজাদ পত্রিকায় লিখতেন। তিনি ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি পাইওনিয়ার প্রেস নামে একটি ছোট ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে দেশের মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে এই শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে মুদ্রণ শিল্পের যে অভাবিত অগ্রগতি হয়েছে তাতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৫৪ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনি পাকিস্তান প্রিন্টিং এসোসিয়েসনের পূর্বাঞ্চল শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং দুই বৎসর নিখিল পাকিস্তান সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬২ সন থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের অনারারি জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৪৯ সন থেকে তিনি দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান--আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সভার সভ্য হন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর কতগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যেগুলি সুধী সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বুলবুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বহু বৎসর যাবৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবেও তিনি একজন পরিচিত ব্যক্তি।

১৯৮৪ সন থেকে এযাবৎ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, একটি আত্মার মৃত্যু, সোভিয়েটে দুই সপ্তাহ ও অন্যান্য রচনা, দুই দশকের স্মৃতি ও ব্যবধান নামে ৫টি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি সুধীসমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর বর্তমান গ্রন্থ ঢাকা আগরতলা মুজিবনগরের পাণ্ডুলিপি যেসব বন্ধু পড়েছেন তাদের ধারণা এর ঐতিহাসিক মূল্য হবে অসাধারণ। তাই বইটি যথাশীঘ্র প্রকাশনার জন্য বন্ধু-বান্ধবেরা পীড়াপিড়ি করছিলেন। সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৮৮ সালে "আমরা সূর্যমুখী" প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তাঁকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পুরস্কার প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্বাধীনভাবে বাঁচার, স্বাধীনভাবে কথা বলার, স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকারের জন্য একাত্তরের সংগ্রামে যারা নীরবে আত্মাহুতি দিয়েছিল, যাদের সর্বহারা মা-বোনেরা আজ পথে পথে কেঁদে ফিরছে, শুধু ডিসেম্বর মাস এলেই যাঁদের কথা আমাদের মনে পড়ে সেই বঞ্চিত মানুষগুলির উদ্দেশ্যে এ বইটি উৎসর্গিত হলো।

www.pathagar.com

লেখকের ভাষ্য

"ঢাকা - আগরতলা - মুজিবনগর" বইটি আমি বছর তিনেক আগে লেখা আরম্ভ করি। ২৫শে মার্চের কালরাত্রি থেকে কোলকাতা পৌছা পর্যন্ত লেখার পর ফেলে রেখেছিলাম। মাঝখানে বছর দুই কিছুটা শারীরিক অসুস্থতার কারণে কিছুটা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আর বেশীদূর লেখা সম্ভব হয়নি। ইচ্ছা ছিল স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ ও বিশ্লেষণ সহ বইটি শেষ করবো কিন্তু লেখা যেভাবে এগুচ্ছিল তাতে আরও দুই বৎসরেও বইটি শেষ হবে কিনা বন্ধুবান্ধবের মনে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় তাঁরা অনুরোধ করলেন বইটি দুই খন্ডে বের করার জন্য। প্রথম খন্ড একাত্তর সনের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত, দ্বিতীয় খন্ডে থাকবে পরবর্তীকালের ঘটনা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত। অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে হলো বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। তাই এই খন্ডে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটনা দিয়েই শেষ করেছি।

এই বইতে মুজিবনগরের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আমি যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছি। আমার লেখায় কে খুশী হবে, কে অসন্তুষ্ট হবে এসব চিন্তাকে আমি মোটেই আমল দেইনি। আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতে যার যেটুকু পাওনা তা পক্ষপাতহীনভাবে দিতে চেষ্টা করেছি। এতে কোন মহলের আশীর্বাদ পাব কোন মহলের বিরাগভাজন হবো এ চিন্তাকে আমি মনে স্থান দেইনি। এ বইতে বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে যে মতামত আমি প্রকাশ করেছি তা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। অনেকে হয়তো আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন। এ মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে অকারণে কারো মনে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি তজ্জন্য আমি দুঃখিত। ছাপার আগে আমার যেসব বন্ধুবান্ধব পাণ্ডুলিপিটি পড়ে বইটি লিখে যেতে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের আবদুল মতিন, মরহুম কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা, প্রফেসর আস্হাব উদ্দিন প্রমুখ এবং আমার স্টাফের মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আবদুল গনি ডিকটেশন গ্রহণ করে, প্রুফ দেখে দিয়ে আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন এজন্য আমি সবার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর কাছে মাত্র তিন দিনে একটি অনিন্দ্য সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার জন্য। তিন দিনে এ প্রচ্ছদ কাইউম চৌধুরী করে দিয়েছে – এ খবর সর্ব মহলে দারুণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত শুধুমাত্র আমার প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর বইটি লেখা বলেই মুক্তিযুদ্ধের একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক বিধায় এত ব্যস্ততার মধ্যেও এত স্বল্প সময়ে কাজটি করে দিতে তিনি সম্মত হয়েছেন এজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তার মহত্বকে আমি ক্ষুণ্ন করতে চাই না।

এম. এ. মোহাইমেন

www.pathagar.com

সুচীপত্র

	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	কালো রাতের পরে ঢাকায়	১
২.	দেশের পথে ঢাকা ত্যাগ	৭
৩.	নারায়ণগঞ্জে প্রত্যাবর্তন	১৪
৪.	পূনরায় নিজ বাড়ীর পথে	১৬
৫.	দেশে পৌছালাম	২৮
৬.	আগারতলা যাত্রা	৩৬
৭.	আগারতলা পৌছালাম	৪০
৮.	কোলকাতা যাত্রা	৫৩
৯.	মুক্তিযোদ্ধা বাছাইয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ	৭২
১০.	স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র	৭৪
১১.	পার্টিতে মতবিরোধ	৭৬
১২.	তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা	৮৩
১৩.	তাজউদ্দিন ও শেখ মনির দ্বন্দ্ব	৮৯
১৪.	মুক্তিযুদ্ধ ও মারওয়ারী ব্যবসায়ী	৯৪
১৫.	তাজউদ্দিন ও মুজিব বাহিনী	৯৬
১৬.	আগরতলায় মিটিং	১০০
১৭.	মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের সাহায্য	১০২
১৮	মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়	১০৫
১৯.	যুদ্ধের প্রস্তুতি	১১১
২০.	শিলিগুড়িতে মিটিং	১১৬
২১.	কনসুলেটের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ	১২৪
২২.	এপারের ও ওপারের আমরা	১২৭
২৩.	স্বাধীনতার চেতনা লুপ্তিকরণ	১৩১
২৪.	আমাদের সাফল্যে নিয়তির প্রভাব	১৪২
২৫.	বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে দেশ স্বাধীন	১৪৮
২৬.	যুদ্ধ আরম্ভ	১৫২

www.pathagar.com

লেখকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী অন্যান্য বই –

১। একটি আত্মার মৃত্যু
২। সোভিয়েতে দুই সপ্তাহ ও অন্যান্য রচনা
৩। দুই দশকের স্মৃতি
৪। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ
৫। ব্যবধান

www.pathagar.com

কালো রাতের পরে ঢাকায়

২৫শে মার্চ '৭১ সনের কাল রাত্রিতে নির্মম হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে ২৬ ও ২৭ পুরাদমে চলে ২৮ তারিখ ভোরে কয়েক ঘন্টার জন্য কারফিউ সিথিল হলো। গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কোথায় কি ঘটেছে যদি কিছু দেখা যায়। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস গুলিতে নাকি দারুন হত্যাকাণ্ড হয়েছে বহু ছাত্র ও শিক্ষক নিহত হয়েছে শুনলাম। সেদিকে কড়া মিলিটারী পাহারা দেখে গেলাম না। পাটুয়াটুলিতে আমাদের প্রেস দেখতে গিয়ে দেখলাম আমাদের বিল্ডিংটি ঠিকই আছে কিন্তু তার আগের দোতলা বাড়ীটি শেলের আঘাতে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। আমাদের পাইওনিয়ার প্রেস থেকেই ছয় দফা হতে '৭০ এর নির্বাচনের আওয়ামী লীগের যাবতীয় কাগজপত্র ছাপা হয়। তাই সামরিক বাহিনীর আক্রমণের একটি প্রধান লক্ষ্য যে আমাদের প্রেস হবে এতে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমাদের প্রেসের দালানটি ধ্বংস না হয়ে তার পাশের দালানটির একটা বৃহৎ অংশ কেন আক্রমনের লক্ষ্য হলো প্রথমে বুঝতে পারলাম না। পরে বুঝলাম এটা ভুল বশতঃ হয়েছে। শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে পাটুয়াটুলীর বড় রাস্তা থেকে। যে বাড়ীটি ভেঙ্গেছে সেটা হলো ১নং এবং আমাদের বাড়ীটি হলো ২নং রমাকান্ত নন্দী লেন। ২ নং এ শেল নিক্ষেপ করলেও সেটা যে ১ নং এ পড়েছে ধূঁয়ায় সম্ভবতঃ চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সৈন্যবাহিনী বুঝতে পারেনি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে করে চলে যায়।

১ নং বাড়ীটিতে কয়েকটি হিন্দু পরিবার বাস করত এবং নিচের তলায় তাদের ঘীয়ের আড়ৎ ছিল। আক্রমনটি হয় ২৭ তারিখ

www.pathagar.com

দুপুরে। সৌভাগ্যক্রমে এই বাড়ীটির সম্মুখের অংশ ধ্বংস হলেও কেউ হতাহত হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রেসের পাঠান দারোয়ানটি মিলিটারীর গুলিতে নিহত হয়েছে। শেলের আঘাতে পার্শ্বের বাড়ী থেকে আগুনের লেলিহান জিহ্বা যখন আমাদের দালানটিকেও আক্রমন করতে উদ্যত হলো, তখন এই অসম সাহসী পাঠান দারোয়ানটি তেতলার ছাদে উঠে বালতি দিয়ে পানি ঢেলে আগুনকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল। জগন্নাথ কলেজের ছাদ থেকে বেশ খনিকটা দূরে পাঞ্জাবী সিপাহীরা এটা দেখতে পেয়ে গুলি করে তাকে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। অবশ্য তাদের লক্ষ্যের ব্যক্তিটি যে একজন পাঠান তা তারা জানত না। এই দারোয়ানটি মারা যাওয়ায় মনে অত্যন্ত ব্যথা পেলাম। লোকটি খাঁটি পাঠান, কথা বলত খুবই কম কিন্তু ছিল অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ। যে কয় বৎসর সে আমাদের প্রেসের দারোয়ান হিসাবে কাজ করেছে সে কয় বৎসর প্রেসে চুরি-চামারী অনেক কম হয়েছে।

সেখান থেকে ফেরার পথে নয়াবাজার গেলাম। সেখানে তখনও আগুন জ্বলছে। নয়াবাজার হলো কাঠের বিরাট আড়ৎ। গত দুইদিন ধরে এই বিরাট এলাকায় কাঠের বড় বড় গুড়ি গুলি জ্বলছিল। দু'দিন কার্ফুর পর ভোর থেকে দুটো পর্যন্ত শিথিল হয়েছে। দু'দিনে কি বিরাট ধ্বংস হয়েছে, কি রকম ওলট পালট হয়েছে দেখার জন্য সন্ত্রস্ত ভীত বাঙ্গালীরা মলিন মুখে এদিক-ওদিক ঘুরে দেখছিল। কথা বলছিল ধীরে ধীরে। লক্ষ্য করলাম কথা বলতে অনেকেরই ঠোঁট কাপছিল তীব্র ঘৃণায়,মন কঠিন হয়ে উঠছিল। ব্যাপারটার এখানেই শেষ হচ্ছেনা। অনাগত ভবিষ্যতে আরও কঠিন দিনের মোকাবেলা করতে হবে এমনি দু'একটা ফিসফিসানি কানে এলো। এরা সবাই ঢাকার আদি বাসিন্দা। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অধিকাংশ তারাই।

সেখান থেকে গোটা এগারয়েকের সময় চলে এলাম ধানমণ্ডি এলাকায় তাজুদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে। খোঁজ নিয়ে শুনলাম বাসায়

www.pathagar.com

কেউ নেই, সবাই সরে পড়েছে। সেখান থেকে ফেরার সময় সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে দেখলাম বামপন্থি রাজনীতিবিদ জনাব তোয়াহা ও যশোহরের আব্দুল হক লুঙ্গি পরে সাদা ক্রেপ জুতা পায়ে দিয়ে কাঁধে একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে মিরপুরের দিকে হেঁটে চলেছেন। রাস্তায় জনতার স্রোত। অনেকেই শহর ত্যাগ করে যাচ্ছে। লক্ষ্য বোধ হয় আরিচাঘাট বা পার্শ্ববর্তী এলাকা। একটি মেয়ে লোককে দেখলাম ঘাড়ে এবং কোলে একটি করে বাচ্চা। তার উপর মাথায় একটি মোট পিছনে পাঁচ ছয় বৎসরের একটি মেয়ে, তার মাথায়ও একটি বোঝা। মেয়েটির বোঝার ভারে হাটতে কষ্ট হচ্ছিল। এরা বোধ হয় বস্তির অধিবাসী, প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রে সৈন্য বাহিনীর আক্রমন এই বস্তিবাসীদের উপরই বেশী হয়েছিল বলে বস্তিবাসীরাই বোধ হয় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বেশী করে শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল।

যাই হোক তোয়াহা ও আব্দুল হককে দেখে তাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য গাড়ী থামালাম। তারা আমাকে দেখেছিল কিন্তু না থেমে দ্রুত হেটে চলে যাচ্ছিল। আমি গাড়ী থেকে নেমে তাদের লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলাম তারা অনেকদূর চলে গেছে। গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে মিরপুরের রাস্তায় তাদের ধরতে পারতাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হলো রাস্তায় মিলিটারী চলাচল করছে। এই জন স্রোতের মধ্যে আমার মত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকের গাড়ীওয়ালা একজন লোক যদি লুঙ্গি ও ময়লা সার্ট পরা দু'জন সাধারণ লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই অস্বাভাবিক সময়ে কথা বলতে থাকি আর তা যদি মিলিটারীর কোন অফিসারের চোখে পড়ে যায় তবে নির্ঘাৎ সে বুঝবে ঐ সামান্য পোষাকে নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। আমিও আওয়ামীলীগের একজন এম, পি,। কারও সন্দেহ হলে যদি চ্যালেঞ্জ করে বসে তবে তাদের ও আমার সবারই বিপদ হবে। আমাকে দেখেও যখন তারা থামল না বুঝলাম আমার সঙ্গে কথা বলা তাদেরও অভিপ্রায় নয়। তাই তাদের অনুসরণ করা থেকে বিরত রইলাম।

www.pathagar.com

এসময় এক ভদ্র লোক এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করল তার পরিবার লালমাটিয়ায় এক বাড়ীতে আটকা পড়েছে। এলাকাটি বিহারী অধ্যুষিত মোহাম্মদপুরের নিকটবর্তী বলে সব বাঙ্গালী পরিবারই নাকি বাঙ্গালী প্রধান এলাকায় সরে যাচ্ছে। ভদ্রলোক বহু চেষ্টা করেও কোন স্কুটার, রিকসা, যানবাহন যোগাড় করতে পারছেন না। আমাকে লালমাটিয়া থেকে তার পরিবারকে নিয়ে মালপত্রসহ পৌঁছে দিতে সকাতরে অনুরোধ জানালেন। সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড় থেকে লালমাটিয়া হয়ে মালিবাগ পর্যন্ত অনেকটা পথ। বেশ পেট্রোল খরচ হবে, তখন শহরের যে অবস্থা তাতে পেট্রোলের কথা ভাবতে হয় বৈকি?

যাইহোক ভদ্রলোকের করুণ চাহনির দিকে তাকিয়ে বললাম উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি। তখন বেলা প্রায় ১টা বাজে। ঘন্টাখানেক পরই কারফিউ আরম্ভ হবে। দ্রুত গাড়ী চালিয়ে লালমাটিয়া তাদের কোয়ার্টারে হাজির হলাম। তাড়াতাড়ি মালপত্র উঠিয়ে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে দু'তিনটিকে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলাম। মাল উঠাবার সময় লক্ষ্য করলাম কোয়ার্টারে আর যারা রয়ে গেল, যারা সরে যাওয়ার জন্য তখনও কোন বাহন যোগাড় করতে পারেনি অথবা যাওয়ার গন্তব্যস্থলও ঠিক করতে পারেনি তারা অসহায় ভাবে ভীতি বিহ্বল চোখে প্রতিবেশীর গৃহত্যাগ দেখতে লাগল। রাতের বেলায় বিহারী এলাকা থেকে আক্রমনের ভয়ে তাদের মনে দারুন উৎকণ্ঠা, যে ভাবে হোক কোয়ার্টার ছেড়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে। যাহোক পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের পরিবারকে তাড়াতাড়ি মালিবাগে পৌঁছে দিয়ে কারফিউ'র আগেই বাসায় পৌঁছে গেলাম।

রাত্রে বাসায় থাকা ঠিক হবেনা মনে করে বিকেলেই গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে নিকটবর্তী এক আত্মীয়ের বাসায় রাত কাটাতে চলে গেলাম। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং নিজামে ইসলাম পার্টির লোক বলে পরিচিত। আমি আওয়ামীলীগের এম. পি হলেও নোয়াখালীর লক্ষীপুর থেকে নির্বাচিত বলে ঢাকার পুলিশ বা

www.pathagar.com

মিলিটারীরা আমাকে চিনবার কথা নয়। এ ছাড়া আমি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে ছিলাম বলে আওয়ামীলীগ নেতা হিসাবে ঢাকায় আমি বেশী পরিচিত ছিলাম না। এখানে আমাকে অন্য পরিচয়ে প্রায় সব মহলই চিনত কিন্তু আওয়ামীলীগ নেতা হিসাবে নয়। তাই ঢাকার বাসায় সহসা গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও ঘনিষ্ট আত্মীয়রা বাসায় না থাকতেই উপদেশ দিল। ২৮ তারিখে রাত্রে নিকটবর্তী আত্মীয়ের বাসায় কাটিয়ে ২৯, ৩০, ৩১ কাটালাম রাজারবাগের একেবারে গায়ে মমিনবাগের ভিতরে মফিজুর রহমান নামে এক এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর বাসায়।

এই বাসায় তখন আশ্রয় নিয়েছেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শওকত ওসমান। তার বাসা রাজারবাগের উল্টোদিকে একেবারে পুলিশ লাইনের গায়ে বলে তিনি খানিকটা ভিতরে চলে এসেছেন। ২৫শে মার্চের রাত্রের পুলিশ ও পাক সেনাদের রাইফেলের ও মটরের লোম হর্ষক লড়াইয়ের কাহিনী মফিজ সাহেবের স্ত্রী রিজিয়া বেগমের কাছে শুনলাম। ট্যাঙ্ক ও মর্টরের বিরুদ্ধে সারা রাত কিভাবে অসম সাহেবের সঙ্গে লড়াই করে শেষ রাত্রে পুলিশেরা তাদের বাড়ীর উপর দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা ছদ্মবেশ ধারনের জন্য পুলিশদের পুরান লুঙ্গি সার্ট সরবরাহ করেছিল। অনিশ্চিৎ যাত্রার মুহূর্তে কিভাবে পাউরুটির দু'পীস বীর যোদ্ধাদের হাতে গুজে দিয়েছিল মফিজ সাহেবের স্ত্রী রিজিয়া বেগম। বাঙ্গালীর সে সার্বজনীন একতা ও লড়াইয়ের দিনে বাঙ্গালী মা বোনেরা যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে জাতীয় বীরদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে নিঃস্বচ্চিত্তে। সেদিনের কাহিনী আজ হয়ত রূপকথার মত শোনাবে–সেদিন কিন্তু সত্যিই তাই ছিল বাস্তব।

তিনদিন সে বাসায় থাকার পর এক জায়গায় বেশী দিন থাকা উচিৎ নয় বিবেচনা করে, তাছাড়া ধরা পড়লে আমাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাদের অসুবিধা হতে পারে মনে করে ১ তারিখের দিকে আমি শাজাহানপুরের শেষ প্রান্তে শহরের একেবারে শেষ

www.pathagar.com

সীমায় একটি মেসে সরে গেলাম। শওকত ওসমান ও আমি বহুদিনের বন্ধু। তিনিও এ মেসে আমার সঙ্গে চলে এলেন কিন্তু দিন তিনেক থাকার পর মেসের জীবন তার কাছে অসহ্য হওয়ায় তিনি রাজারবাগে নিজের বাসায় ফিরে গেলেন। এ মেসটি একটি টিনের ঘর। বেশ নিচু ধান ক্ষেতের উপর মাটি কেটে অনেকটা টিলার মত করে ঘরটি বাঁধা হয়েছে। কোন সিঁড়ি নেই, পা টিপে টিপে অনেক কষ্টে ওঠা-নামা করতে হতো। এখানে আমি নিজেকে একজন আলু ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিলাম। বললাম যে সিলেটে আমার কোল্ড ষ্টোরেজ রয়েছে। আলু কেনার জন্য মুন্সিগঞ্জ এসে আটকা পড়ে গেছি। মেসে লোক বেশী নেই। আমি ছাড়া আর দুজন লোক ছিল। বাড়ীর মালিক পাশেই আর একটি ঘরে থাকতেন। তার সেখানেই প্রথম দুদিন খাওয়া-দাওয়া করলাম, পরে বাসা থেকে চাকর আনিয়ে নিলাম। সেই আমার রান্না-বাড়া করে দিত।

এমধ্যে কারফিউর মেয়াদও কমান হলো, প্রথমে দুপুর ১টা পরে বিকেল ছয়টায় করা হলো। মাঝে মাঝে দশটা এগারটার দিকে বাসায় গিয়ে দুতিন ঘন্টা কাটিয়ে চলে আসতাম। আমার স্ত্রীকে খুব চিন্তিত দেখতাম। সে মোটেই রাজনৈতিক সচেতন নয়। তাই পার্লামেন্টের মেম্বার হয়ে আমি অযথা বিপদ ডেকে এনেছি মনে করে ভিতরে ভিতরে বেশ অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এটা বুঝতাম যে গত কয় বৎসর ধরে ছয় দফা হতে আরম্ভ করে আওয়ামীলীগের যে সব প্রচার পত্র আমি ছেপেছি তাতে মেম্বার হই বা না হই আমার রেহাই ছিলনা। সামরিক সরকারের রোষানলে আমাকে পড়তেই হতো। আমার ছেলেরাও তখন ১৮/২০ বৎসরের হয়েছে। আমার মত রাজনৈতিক সচেতনতা তাদের মধ্যেও ছিলনা। তাই তাদেরকেও উৎকণ্ঠিত ও ভীতি বিহ্বল দেখতাম।

যাহোক আমার ধারণা হলো কিছুদিনের মধ্যে দেশের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বেশ কিছু হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক বাহিনী দেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। শেখ সাহেব,

www.pathagar.com

কামাল হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন এটা জানতে পেরেছিলাম। তাই অল্পদিনেই আন্দোলন থেমে যাবে ভাবলাম। মনে করলাম সরকারের প্রথম রোষের ধাক্কাটা এড়িয়ে মাসখানেক কোন রকমে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে এ যাত্রা বেঁচে যাব, তাই আত্মগোপন করে কিছুদিন কাটাব স্থির করলাম। যে মেসে তখন থাকছিলাম তার সামনে দিয়েই কাঁচা রাস্তা পূর্ব দিকে নন্দীপাড়ার দিকে চলে গেছে। প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষকে দেখতাম মোট-ঘাট মাথায় নিয়ে স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে কেউ রিকসায়, অধিকাংশ পায়ে হেটে পূর্বদিকে যাচ্ছে। পূর্বদিকে মাইল দেড়েক দূরেই একটা প্রসস্থ খাল। সেখান থেকে নৌকায় তারা কোথায় যাচ্ছে জানি না। যে কয়দিন সে মেসে ছিলাম দেখেছি ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত এক সীমাহীন কাফেলা। শহরটাকে মৃত্যুপুরি মনে করে পালিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে।

দেশের পথে ঢাকা ত্যাগ

রোজই রেডিও শুনতাম। এমধ্যে একজন খবর দিল চট্টগ্রামে নাকি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং সেখান থেকে নাকি শেখ মজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। শুনে মন আশার আনন্দে ভরে উঠল। তাহলে পাকবাহিনীর কাছে আমাদের আর সহসা আত্মসমর্পণ করতে হবেনা। এর কয়েকদিন পরেই শুনলাম কোথায় নাকি বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছে এবং তাজুদ্দিন সাহেব তার প্রধান মন্ত্রি নিযুক্ত হয়েছেন বলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে। একথা শুনেই বুঝলাম যে শেখ সাহেব গ্রেফতার হউন আর যাই হোন প্রবাসী সরকার যখন গঠিত হয়েছে তখন সংগ্রাম আর সহসা থামছেনা। এটা দীর্ঘদিন ধরে চলবে। তখনই স্থির করলাম আমাকে যেভাবে হয় নিজের এলাকাতে চলে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে।

www.pathagar.com

ট্রেন চলাচল তখন বন্ধ। ঢাকা নোয়াখালীতে বাস চলাচল তখনও আরম্ভ হয়নি। একমাত্র পথ লঞ্চে যাওয়া। লোক মারফত খবর নিয়ে জানলাম মুন্সিগঞ্জ থেকে নকি চাঁদপুরের লঞ্চ এখনও ছাড়ে। তাই আট কি নয় তারিখ ঠিক মনে নেই একদিন বেশ বড় একটি সুটকেসে নিজের কাপড়-চোপড়, একটি বালিশ, খান দুই বিছানার চাদর, মশারী ও নিত্য ব্যবহার্য্য টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে ভোর আটটার দিকে স্কুটারে করে মুন্সিগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলাম। যাওয়ার সময় আমার বহুদিনের বাবুর্চি নাম আবি, যে আমার চাইতেও বয়সে অনেক বড় সে অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করলো। তার ধারণা জীবনে আমার সঙ্গে আর বোধ হয় দেখা হবেনা। পথে আমি কোথাও না কোথাও মারা পড়ব তাই তার এত কান্না।

নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পর্যন্ত স্কুটারে গিয়ে সেখান থেকে মুটের মাথায় সুটকেস দিয়ে চরের উপর দিয়ে হেঁটে মুন্সিগঞ্জের তক্তাঘাটের দিকে যেতে লাগলাম। শুনলাম সেখান থেকে নাকি একটি লঞ্চ ছাড়বে। তক্তাঘাটের দিকে যেমন বহুলোক যাচ্ছিল তেমনি সেদিক থেকেও নারায়ণগঞ্জের দিকে বেশ কিছু লোক আসছিল। আমার পরণে ছিল লুঙ্গি। হঠাৎ একটি লোকের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হয়ে যেতে চমকে উঠলাম। লোকটি মুসলীম লীগের একজন ছোট-খাট নেতা, তার নাম আজ স্মরণ করতে পারছি না। আমাকে দেখে তিনিও চমকে উঠলেন। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার হাতের উপর বেশ একটু চাপ দিলেন-চাপের অর্থটা বুঝলাম চিনতে পেরেছি, পালিয়ে যাচ্ছেন যান আমাথেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। তক্তাঘাটে আশে পাশে তিন-চারটি লঞ্চ দাঁড়িয়ে ছিল। কোনটা ছাড়বে ঠিক নেই। আগে চাঁদপুরের দিকে ঘন্টায় ঘন্টায় লঞ্চ ছাড়ত নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ থেকে। ২৫শে মার্চের আর্মি অপারেশনের পর লঞ্চ ছাড়ার সময় তালিকা ওলট-পালট হয়ে গেছে। দিনে দু-চারটি ছাড়ে, কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। এরমধ্যে আমরা প্রায় জনা ত্রিশেক প্যাসেঞ্জার জমা হয়েছি। শুনলাম যথেষ্ট প্যাসেঞ্জার না হলে লঞ্চ ছাড়বেনা। যাহোক বেলা ১১টার দিকে

www.pathagar.com

আমরা একটি লঞ্চে উঠলাম। পঞ্চাশ জনের উপর প্যাসেঞ্জার হয়ে গেছে। শুনলাম ৫ টাকা করে ভাড়া দিতে হবে। গণ্ডগোলের আগে দু'টাকা আড়াই টাকা ভাড়া ছিল। সেটা ৫ টাকা হয়েছে শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এত ভাড়ায় যাবেনা বলে দু'চার জন নেমে গেল কিন্তু আমরা অধিকাংশ রাজী হওয়াতে লঞ্চ ছাড়ল।

বেলা গোটা তিনেকের দিকে চাঁদপুর থেকে মাইল আড়াই হবে দূরে থাকতেই লঞ্চ থেমে গেল। চাঁদপুরে নাকি গতকাল পাকবাহিনী বোমা বর্ষণ করেছে, তাই লঞ্চ আর চাঁদপুর পর্যন্ত যাচ্ছে না কারণ সেখানের খবর এখন অনিশ্চিত এবং গেলে বিপদ হতে পারে। সব যাত্রীদের নামিয়ে দিল বাঁদিকের চরে। সে চর থেকে গ্রাম প্রায় মাইল দুয়েক হবে। এটা কোন স্টেশন নয় বলে সুটকেস বইবার জন্য কোন মুটে পেলাম না। আমার বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর, শরীরও বেশ ভারী। নিজের এ ভারী দেহ নিয়ে এত বড় সুটকেস হাতে করে গ্রাম অবধি যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। লঞ্চের সব যাত্রীই দেখলাম যেভাবে হয় নিজের নিজের মালপত্র ঘাড়ে পিঠে করে চরের মধ্যে দিয়ে ক্ষেতের আইল ধরে গ্রামের দিকে হাটতে আরম্ভ করেছে। আমি অসহায় ভাবে কি করব কিছুই বুঝতে না পেরে নদীর ধারে সুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদে ঘামতে লাগলাম। হাতে দামী ঘড়ি, পকেটে সাতশ'র মত টাকা রয়েছে। ভয় ধরে গেল কতক্ষণ পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে। তখন এই জনমানবহীন চরে ডাকাতের হাতে পড়লে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে। পদ্মার চরে ডাকাতির বহু কাহিনী বই-পুস্তকে ও খবরের কাগজে পড়েছি। এই নির্জন স্থানে একা দাঁড়িয়ে ভয়ে ঘামতে লাগলাম। লঞ্চের যাত্রীরা এতক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে। তাদের কাউকে ডেকে যে সাহায্য করতে অনুরোধ করব সে সুযোগও আর নেই।

ঠিক এ সময়ে দেখলাম একটা ছোট ডিঙ্গি পাশের একটা খাড়ি থেকে বের হলো। একটি বুড়ো মাঝি ডিঙ্গিটি বাইছিল, সঙ্গে একটি

www.pathagar.com

ছোট ছেলে। মাঝিকে ডেকে বললাম চাঁদপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে কিনা? সে বলল না হুজুর ওদিকে গণ্ডোগোল আছে, যাবনা। আমি মনে করেছিলাম যদি চাঁদপুর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারি তবে ফরিদগঞ্জ হয়ে রিকসায় রায়পুর পর্যন্ত যেতে পারলে সেখান থেকে নিজের এলাকা পর্যন্ত বাস হোক রিকসা হোক একটা পেয়ে যাবই। কিন্তু মাঝি রাজী না হওয়ায় বিপদে পড়ে গেলাম। তখন পূনরায় ঢাকা ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে মাঝিকে বললাম আমাকে নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে কিনা? মাঝি রাজী হলো, বলল ৫০ টাকা দিতে হবে। তখনকার দিনে ৫০ টাকা অনেক টাকা কিন্তু কি আর করা যায় অগত্যা রাজী হয়ে নৌকায় উঠলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে মাঝি বলল যদি পালে বাতাস পায় এবং আবহাওয়া ভাল থাকে তবে এখন চারটায় নৌকা ছাড়লে রাত নয়টার মধ্যে নারায়নগঞ্জ পৌঁছান যাবে।

নৌকা ছাড়ল। বাতাসও মোটামুটি অনুকূল ছিল। আশা করলাম রাত নয়টা না হোক দশটা নাগাদ নারায়নগঞ্জে পৌঁছাতে পারব অবশ্য পথে যদি ডাকাতে না ধরে। সেখান থেকে মাইল দশেকও আসিনি এমন সময় কালবৈশাখীর ঝড় আরম্ভ হয়ে অসময়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। দারুন ঝড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার মত হলো। এসময় বিদ্যুৎ চমকের আলোতে সামনে একটা খাড়ি দেখতে পেয়ে নৌকাওয়ালাকে খাড়িতে নৌকা ঢুকাতে বললাম। একটা ছোট খাল এসে নদীতে পড়েছে তাই খালের মুখে কিছুটা চওড়া একটা খাড়ির সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুতের স্বল্পালোকে দেখলাম আরও কয়েকটি ছোট নৌকা খাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই ভাবলাম এখানে নৌকা বেঁধে কোনভাবে রাত্রিটা কাটিয়ে দেব এবং কয়েকটি নৌকা থাকার ফলে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচা যাবে।

খাড়িতে ঢোকার পর দেখলাম খানিকটা দূরে একটা লঞ্চ বাঁধা রয়েছে এবং ভিতরে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। বাইরে ঝড় বৃষ্টিতে ছোট নৌকায় রাত কাটান খুবই কষ্টকর হবে। তাই

www.pathagar.com

ভাবলাম যদি কোন রকমে লঞ্চে উঠা যায় তবে খুবই সুবিধা হবে। এ উদ্দেশ্যে নৌকা নিয়ে লঞ্চের কাছে এসে ডাকাডাকি করতে লাগলাম। লঞ্চের দরজা জানালা বন্ধ কিন্তু ভিতরে লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি ও জানালায় করাঘাতের পর একজন খুব ভয়ে ভয়ে একটি জানালা খুলে আমি কে জানতে চাইল। বুঝলাম তারাও ডাকাতের আশঙ্কায় আতঙ্কিত। আমি ঝড়ের পাল্লায় পড়ে রাত্রির জন্য আশ্রয় চাইছি বলে লঞ্চে ঢুকতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু তারা প্রথমে কিছুতেই অপরিচিত লোককে রাত্রে লঞ্চে উঠতে দিতে রাজী হলো না। পরে আমার এক আত্মীয় যার বিরাট লঞ্চের ব্যবসা রয়েছে তার নাম বলায় এবং হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় আমার চেহারা ছুরৎ থেকে আমি খারাপ ধরণের লোক নই বলে তাদের প্রতিতি হওয়ায় দরজা খুলে দিল।

লঞ্চের ভিতরে ঢুকে বেশ খানিকটা সাহস ও স্বস্তি পেলাম। নৌকা থেকে সুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে নৌকাওয়ালাকে বললাম ভোরে আবার নারায়নগঞ্জ রওয়ানা হব। বড় বৃষ্টির ফলে আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা হয়ে শীত করছিল। সঙ্গে একটা সোয়েটার ছিল, গায়ে দিয়ে নিলাম। লঞ্চে বেশ মশা দেখলাম। একটা কাঠের বেঞ্চিতে সঙ্গে যে দু'খানা বিছানার চাদর ছিল তাই দিয়ে শয্যা বানিয়ে নিলাম, অন্যান্য কাপড়-চোপড় যা সঙ্গে ছিল তা লুঙ্গিতে জড়িয়ে একটা বালিশের মত করে নিলাম। কিন্তু মশার আধিক্য দেখে মশারী ছাড়া ঘুমান যাবেনা বুঝলাম। সঙ্গে একটা ছোট মশারী ছিল তা বের করে কোনভাবে খাটিয়ে নিলাম যাতে মশার আক্রমন থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যায়।

নৌকাতে আসার সময় পথে একটা বাজার থেকে একটি পাউরুটি, চাল-ডাল ও কিছু টাটকা পাবদা মাছ কিনে ছিলাম। ইচ্ছে ছিল নৌকায় ঐগুলি মাঝিকে দিয়ে রান্না করে সবাই মিলে রাত্রির আহার সারব কিন্তু তুফান আসায় সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। পাউরুটি আমি নিয়ে মাঝিদেরকে বললাম মাছ ও ভাত রেধে তারা

www.pathagar.com

যেন খেয়ে নেয়। আমি শুকনো পাউরুটিটা চিবিয়েই রাত্রিটা কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম কিন্তু শুতেই ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেল। ঘুম আসার একটু পরেই লঞ্চের একজন লস্কর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাদের সঙ্গে খেতে বসার জন্য অনুরোধ করল। দেখলাম লঞ্চের সারেং, সুকানি, লস্কর মিলে ছয় সাতজন খেতে বসেছে। ডাল ও ইলিশ মাছের তরকারী। আমি প্রথমে খানিকটা আপত্তি করলেও সবার অনুরোধে তাদের সঙ্গে খেতে বসলাম। বেশ ক্ষিধেও পেয়েছে। লঞ্চের পাটাতনের উপর চাটাইয়ে বসে টিনের বাসনে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দুঃখ এবং অনিশ্চয়তা মানুষকে একে অপরের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। নিঃস্বার্থভাবে একজন আর একজনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এটাই পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ, এটাই দেশ প্রেম। আমি একজন অপরিচিত, অচেনা মানুষ এই লঞ্চের সারেং লস্করদের কাছে। তথাপি আমি অভূক্ত শুয়ে আছি জেনে নিজেদের রান্না করা সীমিত খাবারের ভাগ আমাকে দিতে দ্বিধা করল না। এটা আমি পরেও অনেকবার দেখেছি এবং অপরের মুখেও শুনেছি। ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের পরে হাজার হাজার লোক যখন ঢাকা শহর ছেড়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে নিজের গ্রামের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়েছিল তখন এ সুদীর্ঘ পথযাত্রার সময় পথের দু'পার্শ্বের মানুষ চিড়ামুড়ি, ডাল-ভাত, যার যেমন সামর্থ তাই দিয়ে অপরিচিত দেশবাসীকে সাহায্য করেছিল। পথিকদের রাত্রি যাপনের জন্য নিজেদের ঘর ছেড়ে দিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের বিছানা ছেড়ে দিয়ে পথশ্রান্ত ক্লান্ত শহর পালানো মানুষগুলিকে একটুখানি আরাম দেওয়ার জন্য দু'পাশের গ্রামের মানুষ কি নিঃস্বার্থ ভাবেই না সেদিন এগিয়ে এসেছিল সেসব কথা আজ ভাবলে অবাক লাগে।

এ সুদীর্ঘ পথযাত্রার সময় সেসব দুর্দিনে শুনেছি কত গর্ভবতী মেয়েরা পথের ধারে সন্তান প্রসব করেছে। পাশের বাড়ীর মেয়েরা

www.pathagar.com

সে পোয়াতীকে সযত্নে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়ে নবজাতকের জন্য দুধ যোগাড় করে দিয়েছে। একদিন কি দু'দিন সে বাড়ীতে থেকে পথ চলার মত সামর্থ যখন হয়েছে তখন নবজাতক শিশুকে কোলে নিয়ে মায়েরা আবার সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। এ পারস্পরিক সাহায্য, সমবেদনার মূল ভিত্তি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা, দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য সমভাবে দুঃখ ভোগ করার আগ্রহ, দেশ ও সামাজের প্রতি কর্তব্যবোধ। শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের সাহায্যের জন্য পথের দু'পাশে তখন স্থানীয় যুবকেরা গড়ে তুলেছিল অস্থায়ী সরাইখানা যেখান থেকে খাওয়ার পানি সরবরাহ করা হতো, সস্তায় খাবার দেওয়া হতো। অনেক স্থানে চাঁদা করে লঙ্গরখানা স্থাপন করা হয়েছিল যেখান থেকে পথিকদের বিনা পয়সায় খাওয়া দেওয়া হতো।

এসব লঙ্গরখানা দিবারাত্র চালু রাখা হয়েছিল কারণ শহরত্যাগী জনস্রোতের আগমন ছিল বিরামহীন। তাই ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত দেশবাসীকে সাহায্যের জন্য বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর, লোকই স্বতঃপ্রবৃত হয়ে এগিয়ে এসেছিল। এই নিরীহ অসহায় মানুষগুলির অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে লুটপাট করতে বা সুযোগ বুঝে খাদ্য-দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দু'পয়সা মুনাফা লুটার কারও খেয়াল হয়নি। তাই বেশ ভূশায় আমাকে উচু স্তরের লোক জেনেও লঞ্চের সাধারণ শ্রমিকেরা আমাকে তাদের সঙ্গে খেতে আহবান করতে দ্বিধা করল না।

কিন্তু ভেবে অবাক লাগে কোথায় গেল আজ দেশের মানুষের সে অনুভূতি, কোথায় গেল সে দেশ প্রেম, কি করে সেদিনের মানুষগুলি আজ এত আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়েছে, নিজেকে ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারেনা? স্বাধীনতার দু'চার বছরের মধ্যে মানুষের মানসিকতার এ আমূল পরিবর্তন হওয়ার জন্য বোধ হয় আমরাই দায়ী। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি না তাকিয়ে স্বাধীনতার সুফল মুষ্টিমেয় আমরা কয়েকজনই ভোগ করবার চেষ্টা করেছি। তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি দুঃখ, ত্যাগ আর তিতিক্ষা।

www.pathagar.com

তাদেরকে বলেছি তিন বৎসর কিছু দিতে পারব না। তারা তিন বৎসর মুখবুজে কষ্ট সহ্য করেছে। আশা করেছে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হবে, কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে দিন দিন অবস্থার অবনতি হয়েছে। পাকিস্তান আমলের ছয় আনার গামছা দেখতে দেখতে ছয় টাকা হয়ে গেল। ১২ টাকার শাড়ী ৬০/৬৫ টাকা হয়ে গেল। দশ টাকা মনের ইউরিয়া সার ১৪০ টাকা হয়ে গেল, কীটনাশক ঔষধের দাম দশ/বার গুণ বেড়ে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল। সে সঙ্গে কপাল ভাঙ্গল চাষীর, ক্ষেত মজুরদের। স্বাধীনতা পূর্বকালে ২৫ বৎসরে যেখানে ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল ৩৫% এখন সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০% এ। দেশের মানুষের মনে আজ এ জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, এ কি স্বাধীনতা আমরা পেলাম? এ স্বাধীনতা কার জন্য?

দেশের মানুষের মনে এ প্রশ্ন দেখা দেওয়ার কারণ হলো আমরা যারা দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও কর্মী তাদের মধ্যে সন্মানজনক দু'চারজন ছাড়া সবাই দেখতে দেখতে নতুন নতুন গাড়ী ও বাড়ীর মালিক হয়ে গেলাম। আমাদের কাজে আর কথায় লোকেরা সঙ্গতি খুঁজে পেল না। তাই হতাশাগ্রস্থ দেশের মানুষের সে একনিষ্ঠ দেশপ্রেম কর্পুরের মত উড়ে গেল। আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সবাই যেভাবে পারে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় লেগে গেল। কোথায় গেল '৭১ সনের সে ভয়ঙ্কর দিনগুলোর দুঃসহ স্মৃতি, সে দুঃখের দিনের সহমর্মিতা, পারস্পরিক স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা, দেশের জন্য একসঙ্গে দুঃখবরণ করার সে আগ্রহ ও মানসিকতা। রাতারাতি দেশের মানুষগুলির যেন চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল।

নারায়ণগঞ্জে প্রত্যাবর্তন

যাইহোক রাত্রিটা মোটামুটি একরকম আরামেই কাটল। পরদিন ভোরে শুনলাম এই লঞ্চই নারায়ণগঞ্জ যাবে। তাই নৌকায়

www.pathagar.com

না গিয়ে লঞ্চেই নারায়নগঞ্জ যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভাবলাম কারণ তাতে খানিকটা তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব হবে। যদিও নৌকায় এক তৃতীয়াংশ পথও আসিনি তথাপি মাঝিকে ৪০ টাকা দিয়ে বিদায় দিলাম। বুড়ো মাঝি বেশ হৃষ্ট চিত্তেই নৌকা নিয়ে চলে গেল। এদিকে লঞ্চ ছাড়তে ছাড়তে প্রায় ঘন্টা তিনেক দেরী করল কিছুটা যাত্রী সংগ্রহের জন্য কিছুটা তেলের অভাবে। শুনলাম লঞ্চে যে তেল আছে তা দিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই তেলের খোঁজ করার জন্য এদিক ওদিক লোক পাঠাল। পরে জানা গেল মাইল পাঁচ-ছয় দূরে নদীর ধারে এক গ্রামে একজনের কাছে তেল আছে। তখন ভাটি অর্থাৎ চাঁদপুরের দিকে আরও মাইল পাঁচেক গিয়ে ড্রামখানেক তেল নিয়ে লঞ্চ নারায়ণগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলো। এই ঘন্টা তিনেক আমার খুব টেনশনে কাটছিল কারণ ইতিমধ্যে নৌকা বিদায় করে দিয়েছি। তেল সঙ্কট দেখে ভাবছিলাম যদি তেল না পাওয়া যায় আর লঞ্চ যদি না ছাড়ে আমার অবস্থা কি হবে, আবার নৌকা পাব কোথায়? যাহোক তেল নিয়ে লঞ্চ নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বেলা ১২টার দিকে লঞ্চ এসে মুন্সিগঞ্জের কাছাকাছি ভিড়ল। জানিয়ে দেওয়া হলো লঞ্চ নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত যাবেনা। আমি সুটকেস হাতে নিয়ে নদীর উপারে আমার এক ভাগিনার বাসার উদ্দেশ্যে নৌকায় রওয়ানা হলাম। আমার এ ভাগিনাটি বাংলাদেশ মেরিন ডিজেল প্লান্ট ট্রেনিং সেন্টারে চাকুরী করত এবং নদীর ওপারে তার কোয়ার্টার ছিল। আমি সে কোয়ার্টারে পৌছে দেখি ভাগিনার বাসায় তার ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। বাসার অন্য সবাই কয়েকদিন আগে দেশে চলে গেছে।

আমি সে বাসায় সপ্তাহখানেক আত্মগোপন করে রইলাম। কোয়ার্টারের যে মালিক বড় ভাই তার নাম শাহাবুদ্দিন ডাক নাম সাব মিয়া, তার ছোট ভাই যার দেখা পেলাম তার নাম হলো তসকিন উদ্দিন ডাক নাম মিন্টু। দুজনেই ইঞ্জিনিয়ার। মিন্টু রোজ

www.pathagar.com

নিজ হাতে রান্না করে ৯টার মধ্যে খেয়ে চলে যেত। আমি দুপুরে সামান্য ভাত তরকারী খেয়ে নিতাম। রান্না ভোরে এক বারই হতো। সন্ধ্যার দিকে মিন্টু এসে ভোরের রান্না ভাত তরকারী গরম করে নিত। মিন্টু ঢাকার কোন অফিসে তখন চাকরী করত মনে নেই তবে তার ফিরতে ফিরতে রোজই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেত। আমি তার মারফত আমার বাসায় ও আমার বোন তাবেন্দা আখতারের বাসায় মাঝে মাঝে খবরা-খবর আনা নেওয়া করতাম। সারাদিন আমি ধরা পড়বার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকতাম।

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলাম বলেই যে শুধু আমার ভয় ছিল তা নয়, আওয়ামীলীগের যাবতীয় প্রচার পত্র, ছয় দফার সব পোষ্টার আমার প্রেস থেকেই ছাপা হয়েছে। তাই প্রথমতঃ দেশে আমার খোঁজ না পেলে ঢাকার ও ঢাকার আশে-পাশে আমাকে পশ্চিমা সরকার তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াবে এই ভয় আমার বরাবর ছিল। রোজ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জানালার খড়খড়ি তুলে নদীর দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকতাম, খাকি পোষাক পরা বা সন্দেহজনক চেহারার কেউ নৌকা থেকে নামছে কিনা দেখার জন্য। এ ধরণের কাউকে নামতে দেখলেই ঘরের কোন এক গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে পড়তাম এবং প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করতাম এখনই স্বশব্দে বাইরের কড়া নড়ে উঠবে। যখন দশ বার মিনিট পর্যন্ত বাইরে থেকে কোন সাড়া শব্দ আসতনা তখন নৌকা থেকে অবতরণকারী পুলিশের লোক নয় এবং আমার খোঁজে কেউ আসেনি বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়ে গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে আসতাম।

পুনরায় নিজ বাড়ীর পথে

এভাবে সপ্তাহখানেক কাটার পর একদিন মতিন চৌধুরী নামে মিন্টুর এক মামাত কি ফুফাত ভগ্নিপতি সে বাসায় এসে হাজির হলেন। তাঁর বাড়ীও নোয়াখালীর রামগঞ্জ থানায়। তিনি বাড়ীর পথে

www.pathagar.com

সে বাসায় এসে উঠেছিলেন। তখন চারদিকে অবস্থা যা তাতে দেশে যেতে হলে হেটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। তিনি স্থল পথে পথ ঘাট চিনেন এবং পথে পথে দু'চারটি আত্মীয় বাড়ী আছে যাদের সেখানে রাত কাটাবেন স্থির করেছেন। আমি তার সঙ্গেই দেশে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম। তাঁকে অনুরোধ করতেই তিনি সঙ্গে নিতে রাজী হলেন। পরদিন ভোরে গোটা দশেকের দিকে একটি কাপড়ের কাঁধে বোলান ব্যাগে দুটো লুঙ্গি, একটি প্যান্ট, একখানা চাদর, একটি হাওয়াই সার্ট, দুটো পায়জামা একটি পাঞ্জাবি ও একটি গেঞ্জি নিয়ে তার সঙ্গে মুন্সিগঞ্জ ঘাট থেকে লঞ্চ ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। গায়ে ছিল একটি গেঞ্জি, একটি হাওয়াই সার্ট ও পরনে একটি প্যান্ট। পায়ে ছিল সাদা একজোড়া কাপড়ের জুতা। এ ছাড়া সঙ্গে একটি মশারীও নিলাম। বাকী কাপড় চোপড় ও বড় সুটকেসটি মিন্টুকে বললাম কোন সুযোগে আমার বাসায় পৌছে দিতে। তখন মুন্সিগঞ্জ থেকে অনিয়মিত লঞ্চ চাঁদপুরের দিকে ছাড়ে শুনেছিলাম তবে কতদূর পর্যন্ত যায় জানতে পারিনি। শুধু এটা শুনেছিলাম যে, চাঁদপুরে পাঞ্জাবী সৈন্যেরা এসে গেছে তাই লঞ্চ বা কোন নৌকা সে পর্যন্ত যায় না।

যাইহোক লঞ্চে করে বেলা দুটো নাগাদ আমরা চাঁদপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে থাকতেই মনহরদি স্টেশনে নেমে পড়লাম। লঞ্চ আর যাবেনা। সঙ্গে আমার কাঁধে একটি এবং মতিন চৌধুরীর কাঁধে একটি বোলা। তাই পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল না। ক্ষেতের আইলে আইলে এঁকে বেঁকে আমরা গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম। তখন এপ্রিলের দশ কি বার তারিখ। ভীষণ গরম পড়ছিল। চরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে কোন গাছের ছায়া পাচ্ছিলাম না। গরমে হাটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, আমার শরীরটাও বেশ ভারী তাই মতিন চৌধুরী যেভাবে অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আমি পারছিলাম না। বারে বারে পিছিয়ে পড়ছিলাম। যাইহোক ঘন্টা দেড়েক হাটার পর গ্রামে এসে ঢোকার পর গাছের ছায়া পেতে লাগলাম। তখন সূর্যের তেজও অনেকটা কমে এসেছে।

www.pathagar.com

বেলা ৫টা নাগাদ মৈসাদী বলে এক গ্রামে মতিন চৌধুরীর এক আত্মীয় বাড়ীতে পৌঁছে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। বাড়ীতে দেখলাম প্রায় ৭০/৭৫ বৎসরের এক বুড়ো ভদ্রলোক ও দু'চার জন চাকর বাকর রয়েছে। আর লোকজন কেউ নেই। বাড়ীর মেয়েদের পাঞ্জাবী সৈন্যদের ভয়ে আরও ভিতরের দিকে কয়েক মাইল দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মতিন চৌধুরী আমার পরিচয় দিল না কারণ আওয়ামী লীগের এম. পি শুনলে তারা ঘাবড়িয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায়। যাইহোক আমরা পৌঁছার আধ ঘন্টার মধ্যেই আমাদেরকে কয়েকটি ডাব কেটে দেওয়া হলো। ডাব খেয়ে অনেকটা ক্লান্তি দূর হলো। ভাবলাম মতিন চৌধুরী এখনি আবার রওয়ানা হতে বলবে। দেখলাম তিনি তা না করে আজকে রাত্রি এখানেই থাকা হবে জানালেন। শুনে মনটা দারুন খুশিতে ভরে গেল। এ কয় মাইল এসেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

রাত্রে মতিন চৌধুরীর সঙ্গে বুড়ো ভদ্রলোকের দেশের পরিস্থিতি নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ হলো। আমি শুধু শুনেই গেলাম, পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে এই ভয়ে আলোচনায় যোগ দিলাম না। দেশের পরিস্থিতির বিষয়ে ভদ্রলোককে খুব চিন্তিত দেখলাম। তাঁর কাছে শুনলাম তাদের বাড়ী থেকে তিন চার মাইল দূরে দিয়েই কুমিল্লা ও চাঁদপুরের মধ্যেকার পাকা রাস্তা। এ রাস্তা দিয়ে প্রায়ই মিলিটারীরা যাতায়াত করে। যে কোন সময়ে তারা গ্রামে এসে হাজির হতে পারে এই ভয়ে সবাই কম্পমান। চাঁদপুর প্রথমে বিমান থেকে বোমা ফেলে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের হটিয়ে দেয়। তার পর সপ্তাহখানেক পূর্বে কুমিল্লা থেকে সামরিক গাড়ীতে বেশ কিছু সৈন্য এসে চাঁদপুর রেলওয়ে, স্টীমার ঘাট ও শহর দখল করে নেয়। স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা দু'চার জন দলত্যাগী ই. পি. আর সৈন্যের সাহায্যে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠেনি। রাত্রে সামান্য তরকারী দিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম। মেয়েরা কেউ নেই বলে রান্না-বান্নার তেমন সুবিধা

www.pathagar.com

ছিলনা। পথে এই দুঃসময়ে সামান্য কিছু যে খেতে পেলাম এটাই পরম সৌভাগ্য মনে করলাম।

পরদিন খুব ভোরে উঠে আবার রওয়ানা হলাম। কয়েকটি আটার রুটি তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। আলুভাজি দিয়ে তাই খেয়ে রোদ উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। দশটা এগারটা নাগাদ মাইল দশেক আসার পর পা আর চলতে চাচ্ছিল না। এর মধ্যে রোদও খুব কড়া হয়ে যাওয়ায় ঘামে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে কোন ছাতাও ছিল না। বেলা এগারটার দিকে খেয়া নৌকায় একটি ছোট খাল পার হতে গিয়ে নিচের দিকে নামার সময় জুতা স্লীপ করে আমি আট দশ হাত নীচে পিছলে পড়ে গেলাম। বসে বসেই নীচের দিকে নেমেছি বলে পীঠে কোন কাদা লাগল না কিন্তু পরার প্যান্টটি কাদায় নষ্ট হয়ে গেল। খালে নেমে প্যান্ট ও জুতা ভাল করে ধুয়ে নিলাম। প্যান্টটি বদলিয়ে নিয়ে খাল পার হয়ে আবার চলতে লাগলাম। বেলা ১টার দিকে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় এক বাজারে এসে হাজির হলাম। সেখানে এক চায়ের দোকানে বসে কিছু মিষ্টি, বনরুটি ও চা খেয়ে খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম।

উক্ত বাজার থেকে মাইল দুয়েক যাওয়ার পর এক চার রাস্তার জংশনে এসে হাজির হলাম। আমাদের সামনের দিক থেকে একটি হিন্দু পরিবার এসে ডানদিকের রাস্তায় মোড় নিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে কিছু ছোট খাট বোঝা রয়েছে। আমার মনে হলো এরাও বোধ হয় উদ্বাস্তু, দূরে কোন গ্রামে আশ্রয় নিতে চলেছে। আমি ডেকে তাদেরকে থামালাম। একটি বৃদ্ধা মহিলা একটি যুবতী মেয়ে, একজন ৩০/৩২ বৎসরের যুবক ও একটি ৬/৭ বৎসরের ছেলে। যুবতী মেয়েটির দিকে তাকিয়েই বুঝলাম সে গর্ভবতী তাই ধীরে ধীরে কষ্ট করে হাঁটছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে তারা জানালো যে চাঁদপুরের তিন চার মাইল উত্তরে গ্রামে তাদের এক আত্মীয় বাড়ী আছে। মিলিটারীর ভয়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য সে

www.pathagar.com

বাড়ীতে যাচ্ছে। এখনও পথে দু'একটা রিকসা চলাচল করে। রিকসায় যাচ্ছে না কেন জিজ্ঞাসা করায় বলল আর মাইল পাঁচ ছয়েক পথ রয়েছে এর জন্য ভাড়া চাচ্ছে দশ টাকা। এমনিতে ভাড়া ৩/৪ টাকার বেশী হয়না – তাই হেঁটে যেতে হচ্ছে। বুঝলাম এরা খুব দরিদ্র পরিবার তাই দ্বিগুণ আড়াইগুণ ভাড়া দেওয়ার চাইতে এরূপ অসুস্থ শরীর নিয়ে হেঁটে যাওয়াই স্থির করেছে। সংগের পুরুষটি বোধহয় মেয়েটির স্বামী।

শুনে রিকসাওয়ালাদের আচরণে খুব বিরক্ত বোধ করলাম। আমি পকেট থেকে দশ টাকার একটি নোট মেয়েটার হাতে দিয়ে বললাম তোমার চলতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি এ টাকা দিয়ে রিকসা করে যাও। মেয়েটি সকৃত দৃষ্টিতে টাকা নিয়ে সঙ্গের লোকদের সঙ্গে এগিয়ে গেল। তারা খানিকটা দূরে যেতেই আমার মনে হলো ওরাত সংখ্যায় চার জন। ওদেরত দুটো রিকসার দরকার হবে। আমার কুড়ি টাকা দেওয়া উচিৎ ছিল। তারা তখন বেশখানিকটা এগিয়ে গেছে। উল্টোদিক থেকে জোরে বাতাস বইছিল বলে ডাকলেও তারা সহজে শুনতে পাবে না। ইচ্ছে ছিল তাদেরকে ডেকে ফিরিয়ে এনে আরো দশটি টাকা দেই। কিন্তু তার উপায় ছিল না। এদিকে মতিন চৌধুরী অনেকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকে ডাকতে লাগলেন। তাই এই পরিবার ও গর্ভবতী মেয়েটির ক্লান্ত করুন চাহনির কথা মন থেকে জোর করে ঝেড়ে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সমস্ত পথটাই মনে খচ্ খচ্ করে বিধতে লাগল আর দশটি টাকা কেন দিলাম না।

আমার সঙ্গী মতিন চৌধুরী এবার পা চালিয়ে জোরে হাঁটতে বললেন। আমাদের লক্ষ্য এখন নারিকেলতলা বলে ৮/১০ মাইল দূরে একটি গ্রাম। চলতে চলতে বেলা তিনটার দিকে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে এসে হাজির হলাম। এটা কোন এক সময়ে কোন হিন্দু জমিদার বাড়ী ছিল। তারা দেশ ভাগের পরেই চলে গেছে। এখন বাড়ীর কিছু অংশ সরকারী তহশীল অফিস, কিছুটায় স্কুল,

www.pathagar.com

কিছুটায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিস বসেছে। এই জমিদার বাড়ীর কাছে আসতেই প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়, সেই সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি আরম্ভ হলো। আমরা দৌড়ে গিয়ে কোন ভাবে একটা পরিত্যক্ত টিনের ঘরে আশ্রয় নিলাম। বসার কোন বন্দোবস্ত নেই। কয়েকটি গরু ছাড়াও ভিক্ষুক গোছের দু'চার জনও দেখলাম আমাদের মত ঝড় বৃষ্টি তাড়িত হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক তুমুল বর্ষণের পর ঝড় বৃষ্টি থামলে খানিকটা দূরে এক চায়ের দোকানে ঢুকে চা বিস্কুট খেয়ে নিজেদের খানিকটা চাঙ্গা করে তুললাম এবং নারিকেলতলার দিকে অগ্রসর হলাম। প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল বলে রাস্তার অনেক জায়গায় এবং দু'দিকের মাঠে পানি জমে গিয়েছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, আকাশও পুরাপুরি পরিস্কার হয়নি, আবার যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে এই ভয় করছিলাম। দু'পাশের ক্ষেত থেকে ভাঁ ভাঁ করে ব্যাঙ ডাকছিল, শুনে মনে হচ্ছিল পুরা বর্ষাই যেন এসে গেছে।

সন্ধ্যা প্রায় ছয়টার সময় আমরা নারিকেল তলায় এক বাড়ীর সম্মুখে এসে হাজির হলাম। তখনও মাগরেবের সময় হয়নি কিন্তু আবহাওয়ার গুণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল। মতিন সাহেব এক ভদ্রলোকের নাম ধরে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেন কিন্তু কেউ সাড়া দিল না বা দরজাও খুললনা। এদিকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। পথশ্রমে আমি এত ক্লান্ত যে কোন রূপে কোথায়ও একটু বসতে পারলে বাঁচি। আমাদের ডাকে কেউ সাড়া না দিলেও একটু পরে লক্ষ্য করলাম, সুপারী গাছের খোল দিয়ে তৈরী বেড়ার আড়ালে নিঃশব্দে দু'একজন এসে আমাদের বেড়ার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করে আবার বাড়ীর ভিতরে চলে যাচ্ছিল এবং নিঃশব্দ পদচারিণীরা যে মেয়েছেলে এটা বুঝতে পারছিলাম কাঁচের চূড়ির অতি মৃদু টুং টং শব্দ একটু আধটু কানে আসা থেকে।

আমার হঠাৎ মনে হলো এরা নিঃশ্চই আমাদেরকে পাঞ্জাবী সৈন্য মনে করেছে, তাই সাড়া দিচ্ছেনা। একথা আমার সঙ্গীকে

www.pathagar.com

বলতেই তিনি উচ্চস্বরে নিজের পরিচয় ও নাম উল্লেখ করে দরজা খুলতে বললেন। এবার কাজ হলো, একটু পরেই বৈঠকখানা ঘরের দরজা খুলে গেলে আমরা ঢুকলাম। কিছুক্ষণ পরে আলো হাতে এক পৌঢ়া মহিলা প্রবেশ করে আমাদেরকে তারা সত্যিই পুলিশের লোক ভেবে ভয় পেয়েছিল বলল। তখন গ্রাম দেশে সবাই পুলিশের ভয়ে এত আতঙ্কিত যে কোন অপরিচিত লোক দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়ে যেত। মহিলা বললেন সেদিন হাটবার তাই বাড়ীর পুরুষেরা সবাই হাটে গিয়েছে বলে মেয়েরা কেউ সাড়া দেয়নি। যাহোক চৌকির উপর গা এলিয়ে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম, সারা দেহে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে মনে হলো। বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছুতে এবং তার পরেও সংগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরূপ পথে পথে কত কষ্ট করতে হবে ভেবে মনটা ভীষণ দমে গেল। যাইহোক এদুর্যোগ সন্ধ্যাতেও কিছুক্ষণ পরেই গৃহকর্তী চা ও নারিকেল মাখান মুড়ি পরিবেশন করল।

গ্রামাঞ্চলে সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরেও পাতলা কাঁথা ব্যবহারের প্রচলন আছে। একে মালসি বলে। বেড়ে বুড়ে বিছানা করে গায়ে দেওয়ার জন্য মালসি দিয়ে গেল। চা মুড়ি খেয়ে মালসি গায়ে দিয়ে কি আরাম যে অনুভব করলাম তা বর্ণনাতীত। সুখ ও আরাম জিনিষটা বুঝলাম সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার। এর স্থির কোন মাপকাঠি নেই। যেমন নেই উত্তাপের। ৫০ ডিগ্রী উত্তাপের পানিতে হাত দিয়ে পরে ৬৫ ডিগ্রী পানিতে হাত দিলে মনে হবে বেশ গরম আবার ৩০ ডিগ্রী কিম্বা ৪০ ডিগ্রীতে হাত রাখলে মনে হবে অনেক ঠাণ্ডা। ঢাকায় যে পারিবেশে আমি থাকতে অভ্যস্থ তাতে আজকের খাওয়া ও থাকা তেমন কোন সুখকর মোটেই নয় তবে গত কয়েকদিন বিশেষ করে গত দু'দিন ধরে যে কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করছি তার তুলনায় আজকের এ বড়ো সন্ধ্যায় এ খাওয়া ও কাঁথা গায়ে দিয়ে আরাম করে শোয়াটাকে যেন স্বর্গসুখ মনে হলো। শুতেই ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেল। একটু পরেই ডাকাডাকিতে জেগে উঠে দেখি বাড়ীর পুরুষেরা হাট থেকে ফিরেছে। বাড়ীর কর্তা

www.pathagar.com

বজলুর রহমান সাহেব আমার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হলেন। মতিন সাহেব শুধু আমার নাম ও বাপের নাম বললেন। দেখা গেল তার স্ত্রী আমার এক জেঠাত বোনের ভাসুরের মেয়ে। তাদের বাড়ী নোয়াখালী জেলার ভবানীগঞ্জে। কিন্তু আমি যে আওয়ামীলীগের এম. পি. এ পরিচয় তিনি দিলেন না। বুঝলাম সঙ্গত কারণেই তিনি এটা চেপে গেছেন।

যাহোক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া একরকম মন্দ হলোনা। বোয়াল মাছের তরকারী ভাজি ও ডাল দিয়ে খুব তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। অনেক রাত ধরে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে গৃহকর্তা আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। ইনি পূর্বে একটা সরকারী চাকুরী করতেন এখন অবসর নিয়ে দেশে জমি-জমা দেখেন। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার। দেশে যে অশান্তি আরম্ভ হয়েছে – কবে এর শেষ হবে এ নিয়ে সবাই চিন্তিত। ঢাকা থেকে বাজারে জিনিষপত্র আসছে না বলে হাটে জিনিষের দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বললেন। গ্রামে কবে পাঞ্জাবী সৈন্যেরা এসে হাজির হবে এ ভয়ে সবাই চিন্তিত। মেয়েদের কোথায় পাঠান যায় এ নিয়েও অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন।

খুব ভোরে উঠে আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। কোন বাড়ার আগেই যতদূর যাওয়া যায় সেটাই মতিন চৌধুরীর ইচ্ছা। কিন্তু গৃহকর্তী জানালেন আমাদের জন্য নাস্তা তৈরী হচ্ছে সেটা খেয়ে যেতে হবে। এবার গৃহকর্তী আমার সম্মুখে এসে সালাম করল। পরিচয় দিয়ে বলল আমি তাজকেরা – তসলিম মিয়ার বড় মেয়ে। আমার চাচির বিয়ের সময় আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। আপনি আমাকে ছোটবেলায় দেখেছিলেন ভুলে গেছেন। সে আজ প্রায় ৪০ বৎসর আগের কথা। এখন মহিলার বয়স ৪৭/৪৮ বৎসর হবে। আমার চাইতে বছর দুতিনেকের ছোট হবে বোধ হয়। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বহু বৎসর পূর্বে দেখা একটি সুন্দর সুশ্রী বালিকার মুখের কথা আমার আবছা আবছা মনে পড়ল। জীবনে তাদের বাড়ীতে একবারই গিয়েছি আমার জেঠাত বোনের বিয়েতে।

www.pathagar.com

ভোর হয়ে ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল কিন্তু নাস্তা দেওয়া হচ্ছে না বলে আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম বেরিয়ে পড়ার জন্য। তখন শুনলাম সেমাই রান্নার জন্য গ্রামের কোন বাড়ীতে চিনি আনার জন্য লোক পাঠান হয়েছে। গ্রামের হাটে চিনি পাওয়া যাচ্ছেনা বলেই এ প্রচেষ্টা। যাইহোক খানিকক্ষণ পরে সেমাই ও কিছু পিঠা আমাদেরকে খেতে দেওয়া হলো। চিনি বোধ হয় খুব অল্পই পাওয়া গেছে বুঝলাম সেমাইতে নূনের আধিক্য দেখে। পানসা মিষ্টির ভাবটা কাটাবার জন্য প্রয়োজনের চাইতে বেশী নূন দেওয়া হয়েছে। এতদ্বসত্বেও এই দুঃসময়ে মেহমানকে সেমাই খাওয়াবার প্রচেষ্টার মধ্যে যে আন্তরিকতা ফুটে উঠল সেটাই আমাকে মোহিত করল। কর্তা গিন্নি বারে বারে বলতে লাগলেন জীবনে কখনও আপনি আমাদের বাড়ীতে আসেননি। আপনার মত বড় লোক আত্মীয় গরীবের বাড়ীতে এসেছেন কিন্তু এমন দিনে এসেছেন যখন উপযুক্ত সমাদর করতে পারলাম না। তাদের আন্তরিকতা দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম এবং সুবিধা হলে আবার তাদের বাড়ীতে একবার আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

গতকাল বিকেলে ও সন্ধ্যার পরে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় চারিদিকে বেশ পানি জমে গিয়েছিল–ফলে কোন কোন জায়গায় বিশেষ করে যেখানে নতুন মাটি ফেলা হয়েছিল সেই সব স্থান নরম হয়ে নিচের দিকে ফাঁপা হয়ে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে খানিকটা যেতেই পুকুর পাড়ে হঠাৎ আমার পা জুতাসুদ্ধমা টিতে সেঁধে গেল। অনেক কষ্টে পা টেনে তুললাম কিন্তু জুতো কাদার ভেতরই রয়ে গেল। বজলুর রহমান সাহেবের সেজো ছেলে নাসির চৌধুরী জুতাটা টেনে বের করে পুকুর থেকে ধুয়ে পরিস্কার করে আনল। আমিও পাশে জমা ডোবার পানিতে পা ধুয়ে জুতা পরে নিলাম। নাসির আমাদের সংগে সংগে পথ দেখিয়ে প্রায় মাইলখানেক এল তারপর কাঞ্চনপুর যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। এই নাসির ছেলেটি তখন সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণীতে পড়তো ঠিক

www.pathagar.com

মনে নেই। বর্তমানে সে পুলিশ বিভাগে একটি উচ্চ পদে চাকুরী করছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের সরু রাস্তা ধরে আমরা কাঞ্চনপুরের দিকে এগুতে লাগলাম। দু'পাশে বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে সবুজ ইরি ধানের ক্ষেত। এত বড় বিরাট ইরি ধানের মাঠ আর আমি পূর্বে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গত কয়েকদিন যাবৎ মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ার ফলে অনুকূল আবহাওয়ায় ধানের গোছাগুলো বেশ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে বলে সমস্ত মাঠটা বড় নয়নাভিরাম মনে হলো। আশে পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম ডাকাতিয়া নদী থেকে পানি সেচের বন্দোবস্ত আছে বলে প্রতি বৎসরেই এখানে নিয়মিত ইরি চাষ করা হয় এবং কৃষকেরা প্রতি মৌসুমে একরে প্রায় ৭০/৮০ মণ ধান পেয়ে থাকে। তাই ফরিদগঞ্জ থানার এই এলাকায় ইরি চাষ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে রোদ খুব তেঁতে উঠেছে। মাইল দুই–তিনেক আসতেই দারুন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম কিন্তু মতিন চৌধুরী এগিয়ে যাচ্ছেন বলে আমারও তার পিছে পিছে হেটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁর ইচ্ছা দুপুরের মধ্যেই কাঞ্চনপুর চৌধুরী বাড়ীতে গিয়ে পৌছুতে হবে। তাই সহজে তিনি পথে থামতে চাচ্ছিলেন না। যাইহোক আমার অনুরোধে ও আমার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে পথে দু'এক জায়গায় থামলেন এবং সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বেলা ১২টা নাগাদ কাঞ্চনপুর চৌধুরী বাড়ীতে এসে পৌছলেন। এ বাড়ীর প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সৈয়দ গোলাম আহাম্মদ চৌধুরী ওরফে কালু মিয়া। ইনি একজন ছোট খাট জমিদার, অত্যন্ত রসিক ও হৃদয়বান ব্যক্তি বলে সর্বমহলে পরিচিত ছিলেন। যতদূর মনে হয় বছর কি দেড় বছর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। ইনি স্থানীয় এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, স্থানীয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও এককালে নোয়াখালী ডিস্ট্রিক বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। গতকাল রাত যে বাড়ীতে কাটিয়েছি সেই নারিকেলতলা গ্রামটি হলো কুমিল্লা জেলার ফরিদগঞ্জ থানার শেষ প্রান্ত। কাঞ্চনপুর হলো নোয়াখালী

www.pathagar.com

জেলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত। যে চৌধুরী বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম এটি খান দুই দালান নিয়ে বেশ বড় বাড়ী। এরা মতিন চৌধুরীর আত্মীয়। বৈঠকখানায় আমরা বিশ্রাম নিতে লাগলাম। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দামী আসবাব পত্রে সজ্জিত ঘর যেটা বেশ স্বচ্ছল অবস্থার পরিচয় বহন করে।

ঘন্টা দেড়েক পরে আমাদেরকে খাওয়ার জন্য অন্দর মহলে নিয়ে যাওয়া হলো। আয়োজন বেশ ভালই দেখলাম। মাছ, মাংস, ডিম রান্না করা হয়েছে। গত কয়েকদিন এ রকম খাওয়ার সুযোগ আর কখনো ঘটেনি। গত ১৫ দিনে এই বোধহয় প্রথম মুরগীর গোস্ত দিয়ে ভাত খাওয়ার সুযোগ হলো। ঐ গোস্ত দিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সংগে পেট ভরে আহার করলাম। বছর চল্লিশেক বয়সের এক গৌরবর্ণা সুন্দরী মহিলা আমাদেরকে সযত্নে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। ইনি সম্ভবতঃ কালু মিয়া চৌধুরীর আত্মীয়া এবং এর স্বামী তখন স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বাড়ীর পুরুষদের মধ্যে দু'চার জনের সংগে আলাপ হলো। তারা খুব খাতির যত্ন করলেন। তখনকার স্থানীয় অবস্থা নিয়ে কিছু আলাপ আলোচনাও হলো। সবাইকে দেশের পরিস্থিতি ও সামনের দিনগুলির অনিশ্চিত অবস্থার ব্যাপারে খুব আতংকিত ও চিন্তিত দেখলাম। মতিন চৌধুরী আমাকে তার আত্মীয় বলে পরিচয় দিলেন কিন্তু আমি যে আওয়ামী লীগের এম. পি. একথা প্রকাশ করলেন না। সেখানে আমার আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মতিন চৌধুরীর তাগাদায় ভরপেটেই রোদের মধ্যে বেলা আড়াইটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হলো এবং মাইল খানেক এসেই একটা নৌকায় উঠে পড়লাম। ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমাদের নৌকা সোনাপুর বাজারের ঘাটে ভিড়ল।

এই সোনাপুর বাজারটি একটি বিরাট বাজার। পাইকারী ব্যবসার জন্য এটি বেশ বিখ্যাত। ১০/১৫ মাইলের মধ্যে এত বড় বাজার আর নেই। প্রতি হাটের দিন এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার

www.pathagar.com

মালামাল বেচাকেনা হয়। চট্টগ্রাম থেকে প্রচুর মাল এখানে আমদানী হয় এবং চারিদিকে ২০/২৫টি হাটে এখান থেকে মাল সরবরাহ করা হয়। মনে পড়ল এই বাজারে প্রায় বছর খানেক আগে শেখ সাহেব সহ একবার এসেছিলাম। '৭০ এর নির্বাচনের কয়েকমাস পূর্বে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে শেখ সাহেব যখন নোয়াখালী জেলা সফরে আসেন তখন এই সোনাপুর বাজারেও একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সে সময় শেখ সাহেবকে দেখবার জন্য জনতার সে ঢল নেমে ছিল তা কোন দিনই স্মৃতি থেকে মুছবার না। মনে পড়ে এই জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য আমরা যখন গাড়ীতে সোনাপুর বাজারের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে তখন বেলা প্রায় দু'টো। শেখ সাহেবের গাড়ী আমাদের গাড়ীর প্রায় সিকি মাইল আগে ছিল। বাজার থেকে মাইল দেড়েক দূরে থাকতেই পুরো রাস্তা-ঘাট অগণিত মানুষের ভিড়ে এত ভরাট হয়ে গিয়েছিল যে, সভাস্থল থেকে আধমাইল দূরে থাকতেই আমাদের পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে রাস্তার এক পাশে গাড়ী রেখে আমি ও তাজুউদ্দিন সাহেব সহ আরও দুই একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একটি দোকানে আশ্রয় নিলাম।

জনতার দেওয়াল ভেংগে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলনা। আমি তাজুউদ্দিন সাহেবকে বললাম আপনি কষ্ট করে মিটিং এর স্থান পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করুন না। তিনি বিরস মুখে বললেন মানুষতো শেখ সাহেবকেই দেখতে আসে আমাদেরকে তো নয়। আমরাত ফালতু-তাই মিটিংএ আমরা উপস্থিত হই বা না হই তাতে কিছু যায় আসেনা। শেষ পর্যন্ত সেই দোকানেই আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। দূরবর্তী মিটিং এর স্থান থেকে মাইকের আওয়াজ অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু ভেসে আসছিল। কিন্তু কোন কথাই পরিস্কার বুঝা যাচ্ছিল না। ঘন্টা খানেক পরে শেখ সাহেবকে নিয়ে তার সংগের গাড়ীগুলো যখন অতি কষ্টে সভাস্থল থেকে আমাদের দোকানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেল তখন আমরাও গাড়ী নিয়ে তাঁর পিছু পিছু রওয়ানা হয়েছিলাম।

www.pathagar.com

দেশে পৌঁছালাম

যাহোক মতিন চৌধুরী সোনাপুর বাজারে আমাকে একটি দরজি দোকানে বসিয়ে তাঁর পরিচিত লোকজনের সাথে দেখা করার জন্য বাজারে ঢুকে পড়লেন। আমার সংগে তখন নগদ ৬/৭ শত টাকার মত ছিল। এইগুলি নিরাপদে রাখার জন্য আমি দোকানের দরজিকে দিয়ে একটি কাপড়ের খুঁতি তৈরী করে নিলাম যাতে টাকাটা কোমরের সাথে বেঁধে রাখা যায়, ঘন্টাখানেক পরে মতিন চৌধুরী ফিরে এসে আমাকে নিয়ে রামগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলেন। পূর্বেই বলেছি রামগঞ্জ হলো তার বাড়ী। বাজার পেরিয়ে খানিকটা দূর আসতেই এক পুলের গোড়ায় দেখলাম একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। জীপের কাছে আসতেই দেখি রামগঞ্জ এলাকার এম,এন,এ রশিদ সাহেব জীপে বসে চারিদিকে দাঁড়ান কয়েক জন লোকের সাথে কথা বলছেন। আমাকে দেখেই তিনি জীপে উঠিয়ে নিলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর জানতে চাইলেন আমি কোথায় যাব। আমি বাড়ী যাব শুনে তিনি বললেন "চলুন আমি লক্ষ্মীপুর হয়ে মাইজদী যাব - পথে আপনাকে হাজিরপাড়া নামিয়ে দিতে পারব। জীপ রামগঞ্জ হয়ে লক্ষ্মীপুরার দিকে চলতে লাগল।

লক্ষ্য করলাম এক দেড় মাইল দূরে দূরেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে কিছু কিছু লোকজন জমা হয়ে আছে এবং জীপ আসতেই তারা জীপ থামিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে রশিদ সাহেবকে খবরা খবর দিচ্ছে। রশিদ সাহেবও স্থানীয় যুবকদের অদূর ভবিষ্যতে এলাকায় মিলিটারীর আগমন হলে তাদের কিভাবে বাধা দিতে হবে, পূর্বাহ্নেই কিভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশাদি দিতে লাগলেন। এভাবে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা রামগঞ্জ বাজারে এসে পৌঁছলাম। সেখানে বেশ কিছু জনতা এসে

www.pathagar.com

গাড়ীর চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের সংগে রশিদ সাহেব খানিকক্ষণ কথা বললেন। স্থানীয় পরিস্থিতি আলোচনা করে সবাইকে বেশ কিছু সাহস ভরসা দিয়ে রশিদ সাহেব এবার রায়পুর হয়ে লক্ষ্মীপুরের দিকে রওয়ানা হলেন। রায়পুর বাজারেও খানিকক্ষণ কথা বলে আমরা সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্মীপুর এসে পৌছলাম।

সবত্রই একই অবস্থা। সবার মধ্যেই বেশ খানিকটা আতংক কিন্তু যেভাবেই হোক পশ্চিমা মিলিটারীদের রুখতেই হবে। মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে দেশকে স্বাধীন করতেই হবে এই ব্যাপারে সবাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখলাম। আমি এই অঞ্চলের এম. পি। সবাই আমাকে দেখে খুব খশী হলো। সেখানে নাসির আহমদ ভূঁইয়া, ডাঃ আউয়াল, ডাঃ আবুল বাসার, রফিক মাষ্টারসহ আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির দেখা পেলাম। সবাইর সংগে দু'চার কথা বলে তাদের মনোবল ঠিক রাখতে উপদেশ দিয়ে আমরা মাইজদীর দিকে অগ্রসর হলাম। পথে হাজির পাড়াতে নেমে বাড়ীতে না গিয়ে প্রথমে মাইজদী যাওয়াই স্থির করলাম। ভাবলাম মাইজদী হলো জেলা হেড কোয়ার্টার। ঢাকার সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হবার পর সেখানে প্রশাসন ব্যবস্থা কিরূপ দাঁড়িয়েছে, লোকজনের মনের অবস্থা কিরূপ, প্রতিরোধ ব্যবস্থা কতটুকু গড়ে তোলা হয়েছে এই সব সরজমিনে দেখে তারপর বাড়ী যাওয়াই ভাল। কারণ একবার বাড়ী গেলে যানবাহন ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে সহজে আর মাইজদী যাওয়া হবে না। তাই প্রথমে মাইজদী যাওয়াই স্থির করলাম।

সন্ধ্যার বেশ খানিকটা পরে আমরা মাইজদী এসে পৌছলাম। মাইজদী রশিদ সাহেবের বেশ বড় একতলা নিজের বাড়ী রয়েছে। পৈত্রিক নিবাস রামগঞ্জ হলেও পরিবার নিয়ে প্রায় সারা বৎসর তিনি মাইজদীতেই থাকেন। মাইজদীতে এসে দেখলাম সম্পূর্ণ শহর অন্ধকার। দিন আট'দশেক পূর্বেই লাকসাম থেকে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথাও আলো জ্বলছেনা। সমস্ত

www.pathagar.com

শহরটাকেই একটা ভূতড়ে পুরীর মত মনে হচ্ছে। শহরের প্রধান রাস্তার দু'পাশে প্রায় সমস্ত দোকানই বন্ধ। এখানে ওখানে দু'চারটি হারিকেন ল্যাম্প ও কুপি জ্বলছিল। শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাই অনাগত বিপদের আশংকায় পরিবারবর্গ নিয়ে শহর ছেড়ে দেশের বাড়ীতে চলে গেছে। কোর্ট কাচারী বন্ধ, তাই শহরে লোক সমাগমও কম।

রশিদ সাহেবের বাসায় হাত মুখ ধুয়ে চা বিস্কুট খেয়ে খানেকটা জিরিয়ে নিয়ে ডিফেন্স কমিটির অফিসে গেলাম। পরিচিত অপরিচিত বহু নেতা ও কর্মীদের সেখানে দেখা পেলাম। কাদের কাদের ডিফেন্স কমিটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার একটি রেজিষ্ট্রার টেবিলের উপর রক্ষিত আছে দেখলাম। কর্মীদের মধ্যে বেশ খানিকটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পেলাম। সামনে বিপদ যত গুরুতরই হোক না কেন শত্রুকে প্রতিরোধ করতে মরণপণ লড়াইয়ের জন্য সবাই আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক দেখলাম। কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতেই এমন কতগুলি ব্যাপার আমার নজরে এলো যাতে ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে ফলাফল কি হবে সে সম্পর্কে আমার মনে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিল।

অনেক কর্মী এদিক ওদিক থেকে খবরা-খবর নিয়ে আসছিল। কিন্তু প্রশ্নোত্তরে অনেকের কথায় মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাতে বুঝা গেল কর্মীরা খোঁজ-খবর সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেনা। বিভিন্ন ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত ছোটখাট নেতাদের মধ্যেও বিভিন্ন এলাকার শান্তি শৃংখলা, বাজার দর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে মতের সুস্পষ্ট গড়মিল দেখতে পেলাম। চিনি, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কোন কোন এলাকায় ইতিমধ্যেই দারুন সংকট দেখা দিয়েছে এবং কোন কোন বাজারে ব্যবসায়ীরা সরবরাহের অপ্রতুলতার সুযোগ নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে অধিক মূল্য আদায় করছে। এই সমস্ত খবরাখবরে মন বিষন্ন হয়ে

www.pathagar.com

পড়ল। সংগ্রামের শুরুতেই দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ এভাবে ব্যবসায়ীমহলের মধ্যে কেউ কেউ যদি নিতে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত মানুষের দুর্ভোগ যে কোথায় গিয়ে পৌছবে ভেবে চিন্তিত হলাম।

সামনের অফিস ঘরের পিছনের দিকে একটি বড় হল ঘরে অশ্রশস্ত্র রাখা হয়েছে শুনলাম। কত ধরনের এবং কি পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ যোগাড় হয়েছে দেখবার ইচ্ছা হলো। ভেতরে গিয়ে দেখলাম দেওয়ালে ঠেস দিয়ে প্রায় ৫০/৬০টি থ্রি ও থ্রি রাইফেল রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও ৩/৪টি চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল চোখে পড়ল। এক পাশ্বে একটি সাব-মেশিনগানও শোয়ানো রয়েছে দেখতে পেলাম। এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে সর্বাধুনিক অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত পাঞ্জাবী সৈন্যদের কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে তা ভেবে খানিকটা চিন্তিত হলাম। শুধু সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও উদ্দিপনা মনোবল ও দেশ প্রেমই আমাদের একমাত্র সম্বল এবং এই শক্তি সমুহের যথাযথ সমাবেশ, সমন্বয় ও সঠিক প্রয়োগের মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত আছে বুঝতে পারলাম।

কিন্তু সংগ্রাম পরিচালনার ভার যাদের উপর ন্যাস্ত রয়েছে তাদের সংগে দু'চার কথা বলেই বুঝতে পারলাম এ ধরণের সংগ্রাম পরিচালনার এবং শত্রু মোকাবেলা করার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের কারোরই প্রায় নেই। এ ছাড়া কর্মকর্তাদের অধিকাংশেরই নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়ার বেশ খানিকটা অভাব রয়েছে দেখা গেল। আশু সংকট মোকাবেলার ব্যাপারে কোন সম্মিলিত ও সুচিন্তিত চিন্তাধারা বা পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে দেখলাম। ফলে শত্রুকে কার্যকরি ভাবে প্রতিহত করে জনসাধারণকে রক্ষা করা কতটুকু সম্ভব হবে এ ব্যাপারে মনে সন্দেহ জাগল। যাহোক ভারাক্রান্ত মনে রাত ৯টার দিকে রশিদ সাহেবের বাসায় ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। ডিফেন্স কমিটির অফিসে স্থানীয় নেতৃবর্গের মধ্যে মালেক উকিল, নূরুল হক, সাখাওয়াত উল্লাহ, বেলায়েত ও

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহ মিয়া প্রভৃতির সংগে দেখা হলো। প্রত্যেকেই আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলে শত্রুর প্রতিহিংসার প্রধান লক্ষ্যস্থল হবে এই বিবেচনায় আসন্ন বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের পরিবারবর্গর নিরাত্তার প্রশ্নে তাদেরকে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন ও বিচলিত মনে হলো।

পূর্বাহ্নে শতর্কিকরণের অভাবে প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হলে বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং আমিও ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অসহায়বোধ করছিলাম। ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সঠিক কিছু আঁচ করতে পারছিলাম না। অর্ধেক রাত পর্যন্ত রশিদ সাহেবের সংগে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ করছিলাম। তবে তাকেও আমারই মত চিন্তিত ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনিশ্চিত দেখলাম। তবুও দু'জনে মোটামুটি একমত হলাম যে, স্থানীয় প্রতিরোধ সংগঠনের যে অবস্থা তাতে শত্রুকে বেশী দিন রোখা যাবে না। কিছুদিন দেশের এখানে ওখানে আত্মগোপন করে যতদূর সম্ভব গেরিলা যদ্ধের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সংগে যুক্ত হয়ে তাদের সাহায্যে মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ভোর বেলা নাস্তা সেরে একটি রিকসা নিয়ে আমার দেশের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে রাজগঞ্জ হয়ে পুরানো ছয় আনী বাজারে এসে রিকসা ছেড়ে দিলাম। সেখান থেকে আমাদের বাড়ী প্রায় ৩ মাইল, রাস্তা খারাপ বলে রিকসায় আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, তাই কাপড়ের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে হাটতে আরম্ভ করলাম। তখন বেলা প্রায় ৯টা। কিছু পূর্বে নতুন ছয় আনী বাজার অতিক্রম করার সময় স্কুল মাঠে ২০/২৫ জন ছেলেকে দেখলাম লেফ্‌ট রাইট করে সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করছে। অনেকেরই কাঁধে লম্বা বাঁশের লাঠি শোভা পাচ্ছে। সেখানে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা কাজি করিম উল্লাহকে দেখলাম। তার নেতৃত্বেই প্রশিক্ষণ চলছে। তার সংগে মিনিট দশেক কথা

www.pathagar.com

বললাম। স্থানীয় যুবকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দিপনা এবং শত্রুকে যেভাবেই হউক রুখবার একটা দৃঢ় মনোভাব দেখলাম।

এই ইউনিটটি আমাদের পাশের ইউনিয়ন। সর্বত্র একটা কর্মচাঞ্চল্য, প্রস্তুতি এবং জনসাধারণের মনোবল দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। পুরানো ছয়আনী থেকে যখন চলতে আরম্ভ করলাম পথে কোথাও গাছের ছায়া নেই। সম্পূর্ণ পথটাই ছায়াহীন। পথচলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এখান থেকেই আমাদের ইউনিয়ন আরম্ভ হয়েছে। তাই পরিচিত অনেক লোকের সংগেই পথে দেখা হতে লাগল এবং আমাকে দেখে খুশী হয়ে এগিয়ে এসে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। ঢাকা থেকে কিভাবে এসেছি এবং ঢাকার খবর কি সবাই জানতে চাইল। এইভাবে লোকের কৌতুহল মেটাতে মেটাতে প্রায় ১০টার সময় বাড়ী এসে পৌছলাম। আমাদের বাড়ীর সামনেও স্কুলের বিরাট মাঠ। সেখানেও দেখলাম কতিপয় যুবক লেফট রাইট করে সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ছয় আনী স্কুলের মাঠে যা দেখে দেখে এসেছি এখানের চিত্রও হুবুহু তাই। সবারই পরনে মালকোঁচামারা লুংগি, খালি গা এবং খালি পা। কারো হাতে বন্দুক নেই। তার বদলে বাঁশের লাঠি এবং মোটা গাছের ডাল।

আমাকে দেখে সবাই ছুটে এল এবং তাদের মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হলো আমাকে দেখে তাদের সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে। একটু পরেই যখন বাড়ীর অন্দর মহলে ঢুকলাম তখন এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হলো। আম্মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, বারে বারে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরনা আদায় করতে লাগলেন। গত ১৫/২০ দিন আমার কোন খবর না পেয়ে তারা অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং আমি আদৌ বেঁচে আছি কিনা ভেবে, কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ২৫শে মার্চের তিন চার দিন পূর্বে আমার ছোট ভাই মুকিতের বড় মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকেই ঢাকায় আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। ২৫শে মার্চ রাত্রে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ

www.pathagar.com

হওয়ার পর তারা সবাই ঢাকায় আটকে পড়ছিল। তারমধ্যে চট্টগ্রামের একটি দল বহু কষ্টে চাঁদপুর ফরিদগঞ্জ ও রায়পুর হয়ে খানিকটা লঞ্চে খানিকটা নৌকায় এবং শেষ পর্যন্ত রিকসায় করে দিন দশেক পূর্বে আমাদের বাড়ী এসে পৌঁছে। শুনলাম গতকাল তারা চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে।

আমার সেজ ভাই আবদুল মুইদ ওরফে মকু মিয়া এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন কমিটির প্রেসিডেন্ট। আর আমাদের বাড়ীর সামনেই মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং হচ্ছে। এ অবস্থায় পাঞ্জাবী সৈন্যরা একবার এ এলাকায় এসে পড়লে আমাদের বাড়ীর লোক বিশেষ করে আমার ভাই মুঈদের অবস্থা যে কি হবে ভেবে আতঙ্কিত হলাম। ভবিষ্যতের দিনগুলি কি ভীষণ চেহরা নিয়ে দেখাদেবে আন্দাজ করতে পারচিলাম না। যাই হোক ঘটনা নিয়ন্ত্রনের উপর যখন আমাদের হাত নেই তখন ভবিষ্যতের কাছে আত্মসমর্পন করা ছাড়া উপায় নেই এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। বাড়ীতে পৌঁছলাম ১৪ কি ১৫ই এপ্রিল ঠিক মনে নেই। এখানে দিন চারেক থাকলাম। আমি বাড়ী এসেছি শুনে আশে পাশের দুই তিন ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাদের সঙ্গে দেশের সামগ্রীক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। শুনলাম আশে-পাশে হাট বাজার গুলোতে কেরোসিন, চিনি, মসল্লা, ওষুধপত্র এবং কোন কোন জায়গায় নুনের ও কিছু ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং সরবরাহের অপ্রতুলতার সুযোগে কেউ কেউ দামও একটু বেশী নিচ্ছে। মানুষের মনে চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা যখন দেখা দেয় তখন নেশা করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে। মন যখন অস্থিরতায় পীড়িত হয় তখন নেশার মধ্যে শান্তি খোঁজে। এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাই বিড়ি, সিগারেটের উপর খুব চাপ পড়ছিল ফলে দাম ও কিছুটা বেড়ে যাচ্ছিল।

চট্টগ্রাম শহর তখন পাক সেনাদের কবলে, তাই সেখান থেকে কোন সরবরাহ আসছিলনা বলে আশে পাশের হাটবাজারে

www.pathagar.com

মজুদ কমে যাচ্ছিল বলে এই অবস্থা। এমধ্যে ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে শ্রমিকরা ক্রমাগত দেশে এসে পৌঁছাচ্ছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে সর্বাত্বক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন কল-কারখানা অচল করে দিয়ে তদানিন্তন সরকারের সঙ্গে পরিপূর্ণ অসহযোগিতা করার জন্য শ্রমিক সম্প্রদায়কে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনবরত আহবান জানানো হচ্ছিল। সে আহবানে সাড়া দিয়ে দেশ প্রেমিক শ্রমিকেরা প্রানতুল্য চাকরির পরওয়া না করে প্রায় রিক্ত হস্তে দেশের বাড়ীতে এসে পৌঁছাচ্ছিল। ২৫শে মার্চের পরে অনেক কারখানাই খোলা হয়নি এবং যেগুলি খুলেছিল সেগুলির অনেক শ্রমিকই মাইনা পায়নি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে। এসব শ্রমিকেরা দেশে আসার পরে ধীরে ধীরে অর্থ সংকট দেখা দিতে লাগল।

জেলা হেডকোয়াটারের সমস্ত ব্যাংক বন্ধ বলে কারেন্সি নোটের ক্রমাগত অভাব বাড়ছিল, বাজারে ব্যবহার্য জিনিসপত্র বিদ্যমান থাকলেও লোকে টাকার অভাবে কিনতে পারছিল না। আমার তখন মনে হলো পাক সেনারা দু,চার ছয় মাসের মধ্যেও যদি এ অঞ্চলে আসতে না পারে তবুও সাধারণ লেন-দেনের মাধ্যম যে টাকা পয়সা তার অভাবেই দেশে বিশৃঙ্খা দেখা দেবে! দেশে চাল, ডাল, তরি-তরকারি যখন এখনো প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে শুধু লেন-দেনের এই মাধ্যমটিকে সহজ লভ্য করে দিলে অরাজকরা ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বেশ কিছু দিনের জন্য রেহাই পাওয়া যাবে। স্থানীয় নেতাদের সংগে এ বিষয় আলাপ করলাম এবং সবাই আমার সঙ্গে একমত হলো। তখন সাব্যস্ত হলো যেভাবেই হোক প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে কিছু পাকিস্তান কারেন্সি এনে হাজির করতে হবে।

মুজিব নগর সরকার যে কোলকাতা থেকে তাঁদের ক্রিয়াকর্ম চালাচ্ছিল এটা আমরা বেশ বুজতে পারছিলাম। তাই-ভারত সরকারের সহযোগিতায় কিছু পাকিস্তানী নোট ছেপে এখানে পাঠানো যে অসম্ভব হবে না এটা মনে মনে উপলদ্ধি করালাম। আশু

www.pathagar.com

সমস্যার এটাই একমাত্র সমাধান বলে মনে হলো। যেহেতু এখান থেকে প্রবাসী সরকারের সংঙ্গে যোগাযোগের কোন সুযোগই নাই তাই কোলকাতা গিয়েই সামনাসামনি আলোচনার দ্বারা এ পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে কত্পক্ষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চালাবো স্থির করলাম। এদিকে খবর রাখতে লাগলাম পাক সেনারা নোয়াখালীর দিকে কতটুকু আগাচ্ছে। দিন দুই পরে জানতে পারলাম তারা লাকসাম এসে গেছে। তখন বুঝলাম তিন চার দিনের মধ্যে মাইজদী এসে যাবে। তারা চৌমুহনী আসবার আগেই আমাকে চৌমুহনী পারহয়ে যেতে হবে। আগরতলা হয়েই আমাকে কোলকাতায় যেতে হবে তাই শত্রুসৈন্য চৌমুহনী পৌঁছার আগেই আমাকে ফেনী হয়ে ভারতের সীমান্তেবর্তি এলাকা বিলোনীয়াতে পৌঁছাতে হবে।

আগরতলা যাত্রা

১৭ কি ১৮ তারিখ পর্যন্ত জানতে পারলাম পাক সেনারা লাকসাম থেকে রেল লাইন ধরে সোনাইমুড়ী এসে গেছে। আর বিলম্ব না করে সম্ভবতঃ ১৮ তারিখ দুপুর বেলা আমার কাপড়ের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে ফেনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য ১৪ নং দীঘলি ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মিঞা আমার সংগে রওয়ানা হলেন। দু'জনে চন্দ্রগঞ্জ বাজারে এসে ফেনীর বাস ধরলাম। মুক্ত এলাকা গুলিতে তখনো বাস রিকসা চলাচল করছিল। চন্দ্রগঞ্জ থেকে বাসে করে দাঘন ভূঁইয়ার মাইল দুইয়েক পূর্বে পৌঁছোতেই দেখলাম মুক্তিযোদ্ধারা গতকাল রাত্রিতে একটি পুল ভেঙ্গে ফেলেছে। বাস এখানে এসে থেমে গেল। ফেনী থেকে যেসব বাস আসছিল সেগুলোও পুলের অপর প্রান্তে এসে থেমে যাচ্ছিল। এখানে নৌকায় পার হয়ে ওপারে বাসে উঠে ফেনী যেতে হবে। নুর মোহাম্মদ

www.pathagar.com

মিঞাকে এখানে বিদায় দিয়ে আমি নৌকায় চড়ে এপাড়ে এসে বাস ধরলাম। এখান থেকে ফেনী ৭/৮ মাইল দূরে। বেলা দুটো নাগাদ ফেনী শহরে এসে পৌঁছলাম।

পরে জানতে পেরেছি বেলা এগারটার সময় বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার আধঘন্টা পর তোয়াহা সাহেব আমার খোঁজে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভাগ্যিস্ তার সঙ্গে দেখা হয় নাই, দেখা হলে হয়তো আমার আর সীমান্ত অতিক্রম করাই হতোনা। কোন দিন আন্ডার গ্রাউন্ড জীবন কাটাইনি এবং এই জীবনের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ও ছিলনা। তাই একা একা অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়াতে বুক দূরু দূরু করছিল, অতি অসহায় বোধ করছিলাম। যদি তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে দেখা হতো হয়তো কলিকাতা যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে তাঁর এলাকায় চলে যেতাম এবং দেশে থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তাম। পরে ভেবে দেখেছি দেখা না হয়ে ভালই হয়েছে। সীমান্ত অতিক্রম না করলে, কোলকাতা না গেলে বহু বিচিত্র ও মুল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত হতাম, বর্তমানে যে বই লিখছি এই বইও আর হয়তো লেখা হতো না।

যাহোক ফেনী শহরে যখন এসে উপস্থিত হলাম দেখলাম সমস্ত শহরটাই জনশূন্য, রাস্তার দুপাশের সমস্ত দেকান পাটই বন্ধ। অনেক দূরে দূরে মাঝে মধ্যে ভিক্ষুক ও গরীব শ্রেণীর এক আধ জনকে দেখা যায়, রিকসা, যানবাহন প্রায় কিছুই নাই। দু'একটি শীর্ণকায় পথের কুকুর খাদ্যের সন্ধানে এদিক ও দিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত শহরটাকেই একটা ভূতের পুরীর মত মনে হচ্ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মনটা আরো দমে গেল। ক্ষুধায় পেট চনচন করছিল কিন্তু আশে পাশে কোন হোটেল বা খাওয়ার কিছু পাওয়া যায় এমন কোন দোকানই খোলা ছিল না। এদিক ও দিক ঘুরা-ঘুরি করতে করতে একজন রিকসাওয়ালার সঙ্গে দেখা হলে সে বলল রেলওয়ে স্টেশনের ধারে একটি হোটেল খোলা

www.pathagar.com

আছে শুনেছি, সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন। তার কথামত রিকসায় উঠে স্টেশনের ধারে এসে আধখোলা এরূপ একটি হোটেল খুঁজে পেলাম। কিছু খাবার আছে কিনা দোকানীকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, সায়েব ভোর বেলার রুটি আছে তবে আপনে খেতে পারবেন কি? আমি বললাম যা আছে তাই দাও। পেটে তখন আমার আগুন জ্বলছে, বাছ বিচারের কোন প্রশ্নই উঠে না।

দোকানী আমাকে খান দুই তিন তন্দুর রুটি এনে দিল। সে গুলি ভোর বেলা তৈরী করেছে বললেও আমার বিশ্বাস হোল না। খুব সম্ভবত এগুলি গতকালের তৈরী, খরিদ্দারের অভাবে গতকাল বিক্রি হয়নি। রুটিগুলি ছিড়তে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল প্রায় চামড়ার মত শক্ত। তরকারি হিসাবে ঘন সুরুয়াসহ খানিকটা গরুর গোশ্ত দিল। গোশত গুলি অত্যন্ত শক্ত চিবাতেই পারছিলাম না। শুধু সুরুয়া দিয়েই রুটিগুলি ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেয়ে নিচ্ছিলাম। সাধারণ অবস্থায় অসুখের ভয়ে ঐ রুটি, গোশ্ত ঐ পরিবেশে আমি কখনো খেতে পারতাম না কিন্তু এখন আমার যা অবস্থা তাতে অসুখের কথা ভাবতেই পারলাম না।

খাওয়ার পর যখন কত দিতে হবে দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম সে বলল সাত আনা দিন। দাম এত কম চাওয়াতে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। তখন যে অবস্থা তাতে এক টাকা বা দেড় টাকা চাইলে ও আমি আপত্তি করতাম না। তখন বাজার খুব মন্দা, খদ্দেরের খুব অভাব তাই সাত আনার বেশী চাইতে বোধ হয় দোকানীর মন চাইল না। হয়তো এমনও হতে পারে সেই দুর্যোগ ও দুঃখের দিনে দেশের একজন মানুষের কাছ থেকে সে কোন মুনাফা না করে শুধু খরচ টুকুই নিয়েছে। আমার পোশাক-আশাক ও চেহারা দেখে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সাধারণভাবে আমি তার দোকানের খরিদ্দার নই, নেহায়েত দায়ে পড়েই আজ তার খরিদ্দার হয়েছি। তাই কোন রূপ অন্যায় সুযোগ নিতে তার মন চায় নাই।

www.pathagar.com

এটাও দুঃখের দিনে মানুষের জন্য মানুষের দরদের একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একে অন্যকে সাহায্য করবার একটা মানবিক প্রয়াস।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই হঠাৎ সাংবাদিক মোস্তফার সঙ্গে অলৌকিক ভাবে দেখা হয়ে গেল। আমি বিলোনীয়া যাবো শুনে সে তৎক্ষনাৎ বলল চলুন আপনাকে আমি বিলুনীয়ায় পৌছে দিয়ে আসব। তার কথায় বুঝলাম এরমধ্যে সে বিলনীয়া ও আগর তলায় বার কয়েক যাতায়াত করেছে। তার কথা শুনে আমি খুব খুশী হয়ে একটা বেবী টেক্সী যোগাড় করে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হলাম। ফেনী-চট্টগ্রাম পাকা রাস্তায় খানিকটা গিয়েই পশুরামের দিকে আমরা কাঁচা রাস্তায় পড়লাম। গত কয়েক দিন ধরে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে কাঁচা রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। মাঝে মাঝে পানি জমে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। স্কুটার আমাদের নিয়ে একে বেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কোন কোন জায়গায় স্কুটার কাঁদায় আটকে যাচ্ছিল এবং আমরা দু'জনে নেমে ঠেলে তুলে দিচ্ছিলাম। এভাবে আধ ঘন্টার মধ্যে পরশুরাম এসে পৌছলাম। এর পর রাস্তার যা অবস্থা তাতে আর সামনের দিকে এগানো সম্ভব হলো না। স্কুটারওয়ালাকে ৫০ টাকা দিয়ে আমরা দু'জন হেটে বিলোনীয়ার দিকে রওয়ানা হলাম।

পশুরাম হলো নোয়াখালী জেলার শেষ প্রান্ত, এর পরেই ভারতীয় এলাকা আরম্ভ হয়েছে। পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। পথে যেতে যেতে কয়েক বারই আছাড় খেয়ে পড়লাম। পিছনের দিকে সার্ট ও প্যান্ট কাঁদায় ভরে গেল। পাশের ধান ক্ষেতে জমা পানিতে নেমে বারে বারে কাঁদা ধুয়ে নিচ্ছিলাম। পথে মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে ছোট বাজার পড়ছিল। বাজারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করছিলাম বাজারের কেউ কেউ মোস্তফাকে দূরে ডেকে নিয়ে কি সব আলাপ করছিল এবং সময় সময় মনে হচ্ছিল আলাপের বিষয়বস্তু যেন আমি। মোস্তফা ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে

www.pathagar.com

সে বলছিল ও কিছু নয়। আমরা কোথায় যাচ্ছি তাই ওরা জিজ্ঞাসা করছিল।

যাহোকে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল বলে জুতো পায়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। অনেক আগেই জুতো খুলে হাতে নিয়ে ছিলাম। পায়ের আঙ্গুল শক্ত করে মাটিতে টিপে টিপে এগুতে হচ্ছিল তাই ঘন্টায় আধ মাইলও যেতে পাচ্ছিলাম কি না সন্দেহ। মাঝে মাঝে কিছু বৃষ্টিও হচ্ছিল। যে ভাবেই হোক সন্ধার আগেই আমাদের বিলোনীয়া পৌঁছাতে হবে তাই পথে বিলম্ব করার উপায় ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজেই আমাদের এগুতে হচ্ছিল। এভাবে পথে অনেকবার আছাড় খেয়ে সর্ব শরীর কর্দমাক্ত করে সন্ধ্যার একটু পরেই বিলোনীয়া বাজারে এসে হাজির হলাম। বাজারটি বেশ বড়। প্রত্যেক দোকানে দোকানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছিল। মোস্তাফা আমাকে নিয়ে বাজারের উপকণ্ঠে এক বাড়ীতে এসে হাজির হলো। তিন চার খানা টিনের বড় বড় ঘর নিয়ে এখানে একটি হিন্দু পরিবার বাস করছে।

আগরতলা পৌঁছালাম

মোস্তফাকে দেখলাম এদের সংগে খুবই ঘনিষ্ঠ । এরা আমাদেকে খুব সানন্দে গ্রহণ করল। কলতলায় গিয়ে টিউবওয়েলের পানিতে খুব ভাল করে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পরে গোছলও করে নিলাম। তারপর জলযোগ সেরে খানিকটা বিশ্রাম নিতে লাগলাম। মোস্তফাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এরা ফেনীর বিখ্যাত জেনিথ কেমিক্যাল কোম্পানীর লোক। এদের তৈরী পেপটিক ও ডিউড়িয়ান আলসারের ঔষধ খুব বিখ্যাত। নোয়াখালী কুমিল্লা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে জেনিথ কোম্পানীর বিভিন্ন ঔষধ বৎসরে কয়েক কোটি টাকার বিক্রি হয় । তাই এরা বেশ অবস্থাপন্ন ।

www.pathagar.com

রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া খুব ভাল হলো এবং শোয়ার জন্য ভাল বিছানার আয়োজন করে দিল। মোস্তাফা ও আমি এক কামরায় পাশাপাশি চৌকিতে শুয়ে কথা বলছিলাম। পথে যাদের সংগে কথা বলছিল তাদের সংগে কি কথা হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করায় মোস্তফা তখন যে উত্তর দিয়েছিল তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়নি, আমার মনে হচ্ছিল সে আমার কাছে কিছু একটা গোপন করছে।

রাত্রিতে তাকে আবার যখন জিজ্ঞাসা করলাম কি কথা হচ্ছিল তখন সে বললো বাজারের লোকেরা আপনাকে একজন অবাঙ্গালী ধরে নিয়েছিল। আপনার চেহারা মোটাসোটা লম্বা শারীরিক গঠন, উজ্জ্বল গায়ের রং দেখে তারা স্থির নিশ্চিত হয়েছিল যে টাকা নিয়ে আমি একজন অবাঙ্গালীকে সীমান্ত পার করে দিচ্ছি। আপনি যে বাঙ্গালী এবং আওয়ামী লীগের একজন এম, পি এটা আমার বুঝাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। আপনি বোধ হয় লক্ষ্যে করেছেন তাদের সংগে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে আমি এসে আপনার সংগেও দু'একটা কথা বলছিলাম এবং কথা বলার সময় তাদের একটি লোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আপনার কথা ও উচ্চারণ শুনে আপনি যে সত্যিই বাঙ্গালী এটা তাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হলো। ভাগ্যিস আপনি আমার সংগে এসে ছিলেন নচেৎ বিলানীয়া পর্যন্ত পৌছাতে পারতেন কি না সন্দেহ। ঐ সব বাজার অতিক্রম করার সময় আপনাকে অবাঙ্গালী মনে করে কেউ না কেউ দুর থেকে গুলি করে দিত বা ছুরিকাঘাতে হত্যা করত। পরিচয় জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন মনে করতো না। শুনে আমি শিউরে উঠলাম। সত্যিই আমার গায়ের রং অতি মাত্রায় ফর্সা এবং চেহারা সুরৎ যেরূপ তাতে বাঙ্গালী বলে আমাকে অনেকেই মনে করতো না। ফেনীতে মোস্তাফার সংগে দেখা হওয়াটা তাই একটা বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে করলাম।

পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম বলে রাত্রিতে ভাল ঘুম হলো। পাখা চলছিল বলে সারারাত অঘোরে ঘুমালাম। ভোরবেলা পাউরুটি,

www.pathagar.com

অমলেট ও কিছু মিষ্টি সহযোগে ভাল রকম নাস্তা করলাম। চা পান শেষ করে ভোর সাতটার মধ্যে আগর তলার বাস ধরার জন্য মোস্তাফা সহ বেরিয়ে পড়লাম। বাসে উঠে খানিকটা আসতেই হঠাৎ রাস্তার পাশে এক জায়গায় বেশ কিছু লোকের একটা জটলা চোখে পড়ল, দেখলাম কিছু লোক লম্বা একটি দাড়িওয়ালা লোককে মারধর করছে এবং লোকটি দুহাতে মার ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করছে। লোকটিকে দেখে আমি চম্‌কে উঠলাম, এ যে শেখ নূরুল্লা – একজন মুসলীম লীগ নেতা । একে আমি বহু দিন ধরে চিনতাম। সে কি করে এখানে এলো বুঝতেই পারলাম না। দেশের এইরূপ পরিস্থিতে তার এখানে আসবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যে ভাবেই সে এখানে আসুক ক্রুদ্ধ জনতার প্রহারে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার যে মৃত্যু হবে এটা অবধারিত।

ঘটনাটি দেখে আমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম বাস থেকে নেমে গিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি কিন্তু কি করবো না করবো ভাবতে ভাবতে বাস অনেকটা পথ এসে গিয়েছে, বাস থেকে এখন নেমে পিছন দিকে ঘটনার স্থান পর্যন্ত যেতে যেতেই যা হবার তা হয়ে গেছে ভেবে ভারাক্রান্ত মনে গাড়ীতে চুপ করে বসে রইলাম। পরিচিত একটি লোক এভাবে জনতার প্রহারে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আমি তার জন্য কিছুই করতে পারলাম না ভেবে মনটা বিষন্ন হয়ে গেল। পরে অবশ্য শুনেছিলাম শেখ নূরুল্লা নিহত হয়নি। বেশ কিছু মার ধর খেলেও জনতার মধ্যে তার পরিচিত কেউ শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করেছিল। লোকটি তার এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। তার রাজনৈতিক প্রতিদন্দ্বিদের মধ্যে কেউ দেশের ঐ রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে তার কাছ থেকে মোটা টাকা অদায় করার লোভে হাইজ্যাক করে তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। এই প্রভাবশালী লোকটি ফেনী কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবি এ্যাডভোকেট শেখ ওহিদুল্লার বড় ভাই অর্থাৎ বর্তমান এরশাদ সরকারের মন্ত্রী কর্ণেল জাফর ইমামের জ্যেঠা।

www.pathagar.com

যাহোক আমাদের বাস একে বেঁকে উঁচু নীচু রাস্তা ধরে আগরতলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রী বোঝাই ও রাস্তা খুব প্রশস্ত নয় বলে বাস ঘন্টায় ১৫/২০ মাইলের বেশী যাচ্ছিল না এবং এভাবে যেতে যেতে পথে বার কয়েক থেমে বেলা প্রায় দু'টার সময় আগরতলায় এসে পৌছলো। বাস ষ্ট্যান্ডটি বিরাট এবং একটি বেশ প্রশস্ত রাস্তার উপর এটি অবস্থিত। বাস থেকে নেমে রিকশা করে মোস্তাফা আমাকে আগরতলা শহরের এক দোতলা বাড়ীতে নিয়ে হাজির করলো। এই বাড়ীটি নেয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলার এম, পি ও এম, এন, এ'দের থাকার জন্য আগরতলা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। শুনলাম এর মধ্যে প্রায় শ'খানেক এম, পি, এম, এল, এ, সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছে এবং তাদের থাকার জন্য স্থানীয় সরকার এরূপ আরও দু'তিনটি বাড়ী ঠিক করে দিয়েছেন।

এসব বাড়ীতে শুধু যে এম,পি; এম,এন এরাই থাকতেন তাই নয়, বেশ কয়েক জন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, অফিসার ও চট্টগ্রাম বেতারের কর্মীরাও আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানেই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের বেলাল আহম্মদ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ প্রভৃতির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তাদের কাছে শুনতে পাই কালুরঘাটে স্থাপিত বেতার কেন্দ্রটি পাক বাহিনীর বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত হওয়ার পরে কিভাবে তারা এক কিলোয়াট শক্তির ট্রান্সমিটারটি চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে শেষ পর্যন্ত আগরতলায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ট্রান্সমিটারের আয়তন ও ওজন সম্পর্কে পূর্বে আমার কোন সঠিক ধারণা ছিল না। আমি মনে করতাম ছোট-খাট ট্রান্সমিটার যা দিয়ে দেড়'শ দুই'শ মাইল এলাকা পর্যন্ত প্রচার কার্য্য চালান যায় তার ওজন ৭/৮ মনের বেশী হবে না যা অনায়াসে স্থান থেকে স্থানান্তরে বয়ে বেড়ানো যায়। তাই একটি ঘটনা মনে পড়ে নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আকাশ কুসুম কল্পনার কথা মনে করে মনে মনে হাসলাম। হাসবার কারণ হল এর সংগে কয়েক মাস আগের একটি রোমান্টিক স্মৃতি জড়িত ছিল।

www.pathagar.com

ঘটনাটি হল একাত্তরের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন ৩২ নম্বরে আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতার সঙ্গে ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনা বিফল হলে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন সে সব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি মুজিব ভাইকে বলছিলাম আলোচনা বিফল হলে আমাদের গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করতে হবে এবং সে সময় আত্মগোপন করে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে আমাদের সব সময় যোগাযোগ রাখতে হবে, প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে হবে এবং এ প্রচার কার্য্য চালানো ও মানুষের আশা আকাঙ্খা ও মনোবল ঠিক রাখার জন্য একটি ছোট খাট রেডিও ট্রান্সমিটার আমাদের সঙ্গে রাখতে হবে। দেশের যখন যেখানে থাকি ঐ ট্রান্সমিটার মারফত দেশবাসী শেখ সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে এবং পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হবে। আমার কথায় কেউ আপত্তি না করায় বুঝলাম কথাটা সকলেরই মনে ধরেছে। যখন একথাটি বলেছিলাম তখন আমার এবং বোধ হয় শেখ সাহেব বা উপস্থিত অন্য নেতাদের কারও ধারণা ছিলনা একটি ছোটখাট ট্রান্সমিটারের আয়তন এবং ওজন কত হতে পারে।

এখন বেলাল মোহাম্মদ ও আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কাছ থেকে যখন জানলাম এক কিলোয়াট একটি ট্রান্সমিটারের ওজন জেনারেটরসহ ২০/২৫ মন তখন এই যন্ত্রটির সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দেখে নিজের মনেই হাসি এল। বেলাল তারা কালুরঘাট থেকে আগরতলাতে এক কিলোয়াটের ট্রান্সমিটারটি অখণ্ডভাবে একসঙ্গে আনতে পারেননি। তাকে খুলে টুকরো টুকরো করে ট্রাকে করে আগরতলায় এনে পুনঃ সংযোজিত করেছিলেন। বাংলাদেশের সমগ্র মানুষকে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনাতে গেলে অন্ততঃ দুইতিন কিলোয়াটের ট্রান্সমিটার আমাদের প্রয়োজন হত এবং গেরিলা যুদ্ধের সময় এত শক্তির বেতার যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হত কি না খুবই সন্দেহের বিষয় ছিল। বেলাল সাহেব ও তার সঙ্গীরা মোট আট দশ জন ছিলেন এবং চট্টগ্রাম থেকে আগরতলা পর্যন্ত আসতে যে বাঁধা বিপত্তি ও দুঃখ কষ্টের কথা

www.pathagar.com

বর্ণনা করছিলেন তা শুনে অবিভূত হয়ে পড়ছিলাম। স্বাধীনতার অটল আগ্রহ ও গভীর দেশপ্রেম ছাড়া কেউ এত কষ্ট স্বীকার করতে পারে না। দেশ স্বাধীন করার পিছনে কতজনের কত ত্যাগ, কত তিতীক্ষা ছিল কত দুঃখের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে আর আজ সেই স্বাধীনতা নিয়ে কি ভাবে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে যখন ভাবি মনটা বিষাদে ভরে যায়।

নীচের তলায় একটি অপ্রশস্থ কাঠের চৌকিতে আর এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সংগে আমাকে রাত্রি যাপন করতে হলো। একটি মাঝারি ধরনের কামরায় চারখানা চৌকিতে আমরা আটজন শুয়েছিলাম, ঘরের মাঝখানে একটি মাত্র পাখা তাতে বাতাস বিশেষ কিছুই লাগছিল না। ঘরময় অসম্ভব মশা বলে মশারী খাটাতে হয়েছিল। মশারীগুলো নেটের নয়, মোটা সুতার মশারী তাই ভিতরে মোটেই বাতাস লাগছিল না, তাতে আবার এপ্রিল মাসে প্রচন্ড গরম। শোয়ার সময় সতর্ক হয়ে মশারী ঝেড়ে শুলেও রাত্রে কোন ফাঁকে প্রচুর মশা ভিতরে ঢুকে যেত বুঝতে পারতাম না। মোটের উপর মশার কামড়ে ও প্রচন্ড গরমে রাতে প্রায় ঘুমই হতো না। এছাড়া চৌকির পরিসর খুব ছোট বলে দু'জনের পক্ষে চিৎ হয়ে শোয়া সম্ভব ছিল না, দু'জনকেই কাত হয়ে শুতে হতো । একপাশে শোয়া আমার অভ্যাস নয় কতক্ষণ পরেই পাশ ফিরতে হয় এবং স্থানাভাবে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পার্শ্ব ফিরতে হচ্ছিল। যে চৌকিতে আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম সেটি আগে যিনি দখল করে ছিলেন তিনি আমাকে প্রথম থেকেই একজন অনভিপ্রেত সঙ্গী মনে করে খুব প্রীতির চোখে দেখছিলেন না। যেহেতু, চৌকিটির প্রথম অধিকারী তিনি তাই চৌকিটির উপরে তার দখলিসত্বও বেশী এইরূপ মানোভাব নিয়ে চৌকিটির বেশীরভাগ জায়গা তিনি দখল করে রাখতেন। আমি অবাঞ্ছিত সংগীর মত যতটুকু পারতাম গুটি শুটী মেরে এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে থাকতাম।

রাত্রে খাওয়ার দেওয়া হলো এক থালা ভাত পাশে ডাল দিয়ে রান্না করা খানিকটা করলার তরকারী। এই ডালের তরকারী দিয়ে

www.pathagar.com

মেখেই পুরো থালার ভাত খেতে হতো। ভোর বেলা নাস্তা হিসাবে দেওয়া হতো দু'পিস পাউরুটি ও আধখানা সিদ্ধ ডিম। বিকাল বেলা দেওয়া হতো এক পিস পাউরুটি ও খানিকটা চা। ভোরবেলা অবশ্য নাস্তার পরে চা দেওয়া হতো। আমি যে ৮/১০ দিন আগর তলায় ছিলাম খাওয়ার ম্যানুর আর কোন পরিবর্তন দেখিনি পরে অবশ্য ম্যানুর কোন উন্নতি হয়েছিল কি না জানি না। যে কয় দিন আমি আগর তলায় ছিলাম শোয়ার কষ্টটাই আমাকে খুব বেশী পীড়িত করেছিল।

আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি খাওয়ার কষ্টকে আমি কষ্টই মনে করিনা। মুড়ি চিড়া, পান্তাভাত অথবা ভাতের অভাবে যেকোন জিনিষ দিয়েই পেট ভরতে পারলে আমার তাতে কষ্ট হয় না। তরকারীর অভাবে শুধু ডাল দিয়ে বা পান্তাভাত হলে নুন আর খানিকটা মরিচ পোড়া দিয়েই আমি খেয়ে নিতে পারি তাতে আমার কষ্ট হয় না কিন্তু শোয়ার ব্যাপারে আমি বেশ খানিকটা উন্নাসিক। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা বালিশ না হলে আমার ঘুমই আসে না, শুতে ইচ্ছা করে না। রাত্রে সাদা নেটের মশারীতে আমি শুতে অভ্যস্থ। একটি মশাও যদি মশারীর ভিতরে কানের কাছে ভো ভো করে তবে ঐ মশাটি না মারা পর্যন্ত বা বিছানায় যদি ছারপোকা আছে টের পাই তাহলে সারারাতই আমার ঘুম হবে না। আগরতলার মত এত বড় মশা আমার জীবনে পূর্বে কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না, এক একটি মশা প্রায় কোয়াটার ইঞ্চি লম্বা। সন্ধ্যার পর যতক্ষণ মশারীর বাহিরে থাকতাম হাত-পা যতদূর সম্ভব কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হতো। এভাবে যে ৮/১০ দিন আগর তলায় কাটিয়েছি তার কষ্টের স্মৃতি জীবনে ভুলতে পারব না।.

দেশ ছেড়ে এসে থাকা খাওয়ার যে সামান্য অসুবিধা এখানে হচ্ছিল তাতে আমি বিশেষ আমল দিচ্ছিলাম না। খাওয়ার চাইতে থাকার অসুবিধাটা যদিও আমাকে বেশী কষ্ট দিচ্ছিল তথাপি সাধারণ উদ্বাস্তুদের যে অবস্থা বিভিন্ন শিবিরে লক্ষ্য করলাম সে তুলনায়

www.pathagar.com

আমরা স্বর্গসুখে আছি মনে হলো। ইতিমধ্যে প্রায় লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আগরতলায় এসে হাজির হয়েছে। এর মধ্যে দু'চারটি উদ্বাস্তু শিবিরে যা দেখলাম তাতে মন ভীষণ দমে গেল। গাদাগাদি করে হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ অস্থায়ী শিবির গুলোতে পড়ে আছে। সরকার থেকে যতুদর সম্ভব সাহায্য করবার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে সাহায্য খুবই অপ্রতুল। অতি অল্প সময়ের নোটিশে সে সমস্ত শিবির গড়ে তোলা হয়েছে, তাই সুষ্ঠু ব্যবস্থা বোধহয় তেমন করা সম্ভব হয়নি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছে পাক বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে পলাতক ভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষগুলোর দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য। কিন্তু তাদের পক্ষে কতদূর করা সম্ভব? বন্যার স্রোতের মত অনবরত জনস্রোত আসছে, তাদের জন্য সুষ্টু ব্যবস্থা কতদুর করা যেতে পারে?

যা হোক আমরা যে দিন আগরতলা পৌঁছলাম তার পরদিন মোস্তাফা এসে আমাকে সি, পি, এম, এর সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাস গুপ্তের সংগে দেখা করাবার জন্য নিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টি সি, পি, এম এর সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাস গুপ্ত তখন কয়েক দিনের জন্য আগর তলায় এসেছিলেন। তাঁর সংগে আমাদের ছয় দফা আন্দোলন ও পরবর্তীকালের সংগ্রাম আরম্ভ, আওয়ামী লীগের রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে তর্কের মুখে আমি কোনঠাসা হয়ে পড়লাম। শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী প্রমোদ দাস গুপ্তের জেরার মুখে শেষ পর্যন্ত আমি আর কোন উত্তরই দিতে পারছিলাম না। তিনি বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কার স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে? কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এটা পরিচালিত হয়েছে? কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বা কি উদ্দেশ্য এতদিন সরকারের সংগে নিস্ফল আলোচনা চালান হয়েছে? ছয়দফা মানে যখন প্রায় পুর্ণ স্বাধীনতা, যা পাকিস্তান সরকার মানতেই পারেনা তেমন অবস্থায় আন্দোলন চালাতে গিয়ে নিরস্ত্র জন সাধারণকে রক্ষার কি ব্যবস্থা

www.pathagar.com

আমরা পূর্বাহ্নে করেছি এবং না করে থাকলে কেন করিনি এ সমস্ত প্রশ্নে তিনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। ছয়দফা ছেপে দিলেও আমি ছয়দফা আন্দোলনের সংগে ওতপ্রোত বা সক্রিয়ভাবে কখনও জড়িত ছিলাম না, অধিকন্তু কোনদিনই আমি আওয়ামী লীগের ইনার সার্কেলের লোক ছিলাম না। প্রিন্টার হিসাবে পার্টির প্রতি আমার অবদানের জন্য শেখ সাহেব আমাকে নমিনেশন দেন। তাই কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, কোন নীতি অনুসরণ করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছলাম এবং সেই নীতির সারবত্তা ব্যাখ্যা করে আমি অনেক চেষ্টা করেও প্রমোদ দাস গুপ্তকে আমাদের গৃহীত নীতির যৌক্তিকতা বুঝাতে পারলাম না, এছাড়া পুরো ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেও অনেকটা কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল।

আগরতলায় আমি আট দিন ছিলাম। পরিচিতদের মধ্যে কারা কারা সীমান্তে অতিক্রম করে আগরতলায় পৌঁছেছে খোঁজ নিতে লাগলাম। আমার অনেক দিনের বন্ধু আত্মীয় ন্যাপ নেতা দেওয়ান মাহবুব আলীও আগরতলায় পৌঁছেছে শুনলাম কিন্তু তাঁরা সংগে দেখা হলো না। আগর তলার এক ডাক বাংলোতে কয়েকজন ডাক্তার স্বপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরা উদ্বাস্ত ও গেরীলা যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করছিলেন। তাদের মধ্যে আমেনা নামে আমার এক ভাগ্নিকে খুঁজে পেলাম, তার স্বামী ডাক্তার। চট্টগ্রাম থেকে এরা পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমি আগর তলায় পৌঁছার দু'এক দিন পরেই কুমিল্লার হোমনা থানার এম, পি মোজাফ্ফর আলী এসে আমাদের আশ্রয় কেন্দ্রে হাজির হলেন। ইনি তাজউদ্দিন সাহেবের ঘনিষ্ট বন্ধু এবং তাঁর বাড়ীতেই এর সংগে অনেক বার দেখা হয়েছে। ইনি অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের স্বন্তান। খাওয়াতে পরাতে না পেরে এর বাবা শৈশবে একে এক হিন্দু ব্রাহ্মনের বাড়ীতে কাজ করতে দিয়েছিলেন। সেই হিন্দু ভদ্রলোক একে সন্তানতুল্য স্নেহ করে মানুষ করতে থাকেন। ছোট বেলাতেই এর মেধার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন

www.pathagar.com

এবং পরে নিজের চেষ্টায় ও প্রতিভার গুণে মোজাফ্ফর সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে এম, এ ডিগ্রী গ্রহণ করেন। তাজউদ্দিন সাহেবের ইনি সহপাঠী। নিজে দরিদ্র ঘরের সন্তান ও খুব কষ্ট করে মানুষ হয়ে ছিলেন বলে এতিম ও দুঃস্থদের প্রতি তাঁর স্নেহ মমতা ছিল অপরিসীম। তাই এদের জন্য ঢাকার সোনার গাঁওএর উপকন্ঠে মোজাফফর আলী ফাউন্ডেশন নামে বৎসরাধিক কাল পূর্বে একটি এতিম খানা স্থাপন করেছেন। সেখানে শ'খানেক এতিম ছেলেমেয়েকে বিনা খরচায় থাকা খাওয়া লেখা পড়া ও ভোকেশোনাল ট্রেনিং দেওয়া হয়।

মুজাফ্ফর আলী সাহেবের সংগে দেখা হতেই তিনি বললেন মোহাইমেন ভাই আমি এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছি, পরনের লুঙ্গিটি ও গায়ের পাঞ্জাবীটি ছাড়া আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। আপনার সংগে বেশী জামা কাপড় থাকলে আমাকে দিন। আমার সংগে তখন পরার প্যান্ট ছাড়াও দুইটি পায়জামা ছিল। তার মধ্যে একটি পায়জামা তাকে দিয়ে দিলাম। এটি পেয়ে তিনি যে কি পরিমাণ খুশি হলেন তা বলার নয়। পরে তাঁর সংগে আমার যত বার দেখা হয়েছে ঐ পায়জামা দেওয়ার কথা তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করতেন। একটি পায়জামা এমন কিছুই নয়। কিন্তু ঐ দুঃসময় ও অনিশ্চয়তার দিনে দু'টি পায়জামার মধ্যে একটি দিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে মমত্ববোধ ও সহমর্মীতা প্রকাশ পেয়েছিল সেটাই তাকে মুগ্ধ করেছিল।

আমাদের আশ্রয় কেন্দ্রে গোসলের তেমন সুবিধা ছিলনা। তাই পাশ্বেই একটি পুকুরে আমি গোছল করতে যেতাম। এক দিন গোসল করতে গিয়ে একটি লোকের সংগে আমার দেখা হলো। কথায় মনে হলো লোকটির আগরতলার অধিবাসী নয়। পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বললো সে ই,পি, আর এর একজন পলাতক সৈন্য। এখানে এসে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে যখন বললাম আমি আওয়ামী লীগের একজন এম,

www.pathagar.com

পি, লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে যেন আমাকে মারতে আসবে মনে হলো। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগকে একটা অশ্লীল গালি দিয়ে লোকটি বললো এই কি আপনাদের রাজনীতি? দেশের মানুষের প্রতি কি আপনাদের কোন দায়িত্ব বোধই ছিলা না? কেন, কি হয়েছে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করতে লোকটি বললো ঢাকা ক্যান্টণমেন্টে যে, সে সময় পস্তুতি চলছিলো এটা আমরা জানতে পেরেছিলাম এবং শেখ সাহেবেকে খবর দিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু ২২শে মার্চ যখন তাঁকে আলোচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন, অগ্রগতি নিশ্চয়ই হচ্ছে নচেৎ আলোচনা চলছে কেন? শেখ সাহেবের সেই বিবৃতিতে আমরা সামরিক বহিনীর লোকেরা শান্তিপূর্ণ মিমাংসা হয়ে যাচ্ছে মনে করে নিশ্চিন্ত রইলাম, আমাদের পরিবারবর্গকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরাবার কোন উদ্দোগ নিলাম না। তাই ২৫ শে মার্চ যখন আক্রমন আরম্ভ হল আমার পরিবারবর্গকে ক্যান্টনমেন্টে ফেলেই প্রাণ নিয়ে আমাকে পালাতে হলো। এটা শুধু আমার ব্যাপারেই ঘটেনি আমাদের রেজিমেন্টের অনেকের ব্যাপারেই ঘটেছে। এখন আমাদের পরিবারের ভাগ্যে কি ঘটেছে এবং তারা কোথায় আছে আমরা কিছুই জানিনা বলে লোকটি প্রায় কেঁদে ফেললো। শেষে বললো ২২সে তারিখে যদি শেখ সাহেব আলোচনার সাফল্য সমন্ধে অত দৃঢ় ভাবে কিছু না বলে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করতেন তবে আমরা অনেকে ২৩/২৪ তারিখের মধ্যে পরিবার সরিয়ে নিতাম।

যা হোক ঐ সময় বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ সাহেবকে রাজনীতির খাতিরে বাধ্য হয়েই ঐ কথা বলতে হয়েছিল একথা বলেও লোকটিকে সন্তোষ্ট করতে পারলাম না। দেশের মাটি ছেড়ে বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত অবস্থায় যে ভাবে বিদেশের মাটিতে এসে প্রাণ বাঁচাবার জন্য আশ্রয় আমাদের নিতে হয়েছে, নির্বাচনের পর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের কৌশল যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাতে সৈনিকটির অভিযোগকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। আন্দোলনকে অপরিকল্পিত ভাবে ঠেলে

www.pathagar.com

তুঙ্গে তুলে নিয়ে নিরস্ত্র সমগ্র দেশবাসীকে শেষ পর্যন্ত বন্দুকের মুখে ঠেলে দিয়ে প্রধান নেতার আত্মসমর্পন এবং বাকী নেতা ও উপনেতাদের দেশ ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ কতটুকু যৌক্তিক ও বাস্তবধর্মী কাজ হয়েছে নিজের কাছেও জবাব দিহি করে উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।বার বার মনে হচ্ছিল কোথাও একটা বিরাট ভূল হয়ে গেছে।

আগরতলায় পৌছার দিন চারেক পরে একদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের এম, এন, এ এম, আর, সিদ্দিকী, জহুর আহম্মদ, তাহের উদ্দীন ঠাকুর ও আরও কতিপয় নেতৃবৃন্দ আমাদের আশ্রয় কেন্দ্রে এলেন। দেশের সামগ্রিক অবস্থা, মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি এসব বিষয় নিয়ে তারা অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন। তারা বেশীর ভাগ সময়ই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আলোচনা করছিলেন। আমি তাদের সংগে অনেকক্ষন ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাদের আলোচনা শুনছিলাম। এম, আর সিদ্দিকীর নাম আমি আগে শুনলেও তার সংগে আমার সাক্ষাত পরিচয় ছিল না। সেদিন তার কথাবার্তা ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ, মুক্তিযুদ্ধের কৌশল, পাক বাহিনীর দুর্বলতা ইত্যাদি সম্পর্কে তার জ্ঞান গর্ব আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করল। সংগে যেসব নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাদের সংকল্পের দৃঢ়তা আশু বিজয় সম্পর্কে তাদের গভীর বিশ্বাস আমাকে অনেকটা আশ্বান্বিত করে তুলল। গত কয়েক দিনে পথকষ্ট অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে যে অবসাদ ও হতাশা এসেছিল তা অনেকটা কেটে গেল। মনে হল আমাদের মধ্যে এত যোগ্য ব্যক্তিরা যখন রয়েছেন তখন মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি আমরা দেখতে পাবই।

আমরা যখন পথ চলছি তখন রাত প্রায় নয়টা। এ সময় দক্ষিণদিক থেকে বিরাট বিরাট সেল ফাটার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সিদ্দিকী সাহেব বলছিলেন দুদিকেই গোলা-গুলি চলছে – দক্ষিণের থেকে পাক বাহিনী আগরতলার সীমান্তের দিকে গোলাবর্ষণ করছে

www.pathagar.com

আর ভারতীয় বাহিনী তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধারা খুব সম্ভব পাকিস্তান এলাকায় ঢুকে পড়ে বিভিন্ন সীমান্ত ঘাটিতে কিছু কিছু আক্রমণ আরম্ভ করেছে যার ফলে পাক বাহিনী সেল বর্ষণ করছে। এখানে আসার পর আমি প্রতিদিনই লক্ষ্য করেছি সন্ধ্যার একটু পর থেকে এগোলা গুলির শব্দ আরম্ভ হয় এবং রাত্রির গভীরতা যত বাড়তে থাকে গোলাগুলির পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ রাত্রে গিয়ে থেমে যায়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন শব্দ শোনা যায় না। তাতে বুঝলাম দিনের বেলা মুক্তি বাহিনী সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকে তাই কোন পক্ষ থেকেই গোলা-গুলি বর্ষিত হয় না। এটাও লক্ষ্য করেছিলাম প্রতিদিনই গোলা-গুলির আওয়াজ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। এতে মনে আশা জাগছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ দিন দিন অধিকতর সংঘটিত হয়ে পূর্ণ পরিণতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আগরতলায় থাকা আমার পক্ষে ক্রমে কষ্টকর হয়ে উঠছিল, বিশেষত শোয়ার কষ্টের জন্য। তাই যথাশীঘ্র কোলকাতা চলে যেতে মনস্থ করলাম। কোলকাতা যাওয়ার দুটি পথ ছিল, একটি হলো বিমানে অন্যটি হলো ট্রেনে। বিমানের ভাড়া ছিল বোধ হয় তখন ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াইশ রুপীর মত আর ট্রেনে ছিল ৭০/= টাকার কাছাকাছি। এতদিন পরে সঠিক অংকটা মনে পড়ছেনা। বিমানে আসন পাওয়া ছিল খুব কষ্ট সাধ্যের ব্যাপার। একদিন বিমান অফিসে গিয়ে দেখলাম আগামি প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত সব সিট বুক্‌ট। এখন কি করা যায় ভাবতে লাগলাম। ট্রেনে কোলকাতায় পৌঁছাতে প্রায় চার পাঁচ দিন সময় লাগে। আসামের গোহাটি হয়ে, জলপাইগুড়ি হয়ে যেতে হয়। বিরাট দূরত্ব। এ ছাড়া আগরতলা থেকে বাসে বা টেক্সিতে প্রায় একশ চল্লিশ মাইল গিয়ে আসামের সর্বদক্ষিণে ধর্মপুর বলে এক স্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে হয়। শুনলাম সেখানে ট্রেনে উঠা নাকি এক দারুন কষ্টের ব্যাপার। আগরতলা থেকে ট্রেনের উপরের কোন শ্রেণীতে অগ্রীম বুকিংএর কোন বন্দোবস্ত নাই। শুনলাম রিফুউজিদের মধ্যে যারা ট্রেনে কোলকাতা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই দু'দিন তিনদিন ঠায় দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

থেকে অশেষ কষ্ট করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাচ্ছে। এভাবে দু'তিন দিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকার কথা মনে হতেই শিউরে উঠলাম। আমার পক্ষে এত কষ্ট করা সম্ভব হবে না। তাই যেভাবে হোক প্লেনে সিট যোগাড় করতে মনস্থ করলাম।

বিমান অফিসের কর্তার সঙ্গে দেখা করে পরিচয় দিলে তিনি বললেন সরকারের জন্য প্রত্যেক ফ্লাইটে কয়েকটি সিট রিজার্ভ থাকে। আপনি আপনার ক্যাম্পের পরিচালকের কাছ থেকে পরিচয় পত্র আনতে পারলে সেখান থেকে একটি সিট দিতে পারি। যা হোক ঐ প্রক্রিয়ায় দিন দুয়েকের মধ্যে আমি কোলকাতার একটি সিট পেয়ে গেলাম এবং ২৮শে এপ্রিল সকাল ন'টায় প্লেনে রওয়ানা হলাম। পথে বিমান গোহাটিতে নামল। তারপর এক উড্ডয়নে বেলা প্রায় তিনটার সময় দমদম বিমান বন্দরে এসে পৌঁছালাম। ২৫শে মার্চের বেশ কিছুদিন আগে থেকে ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক এর ব্যাপার নিয়ে ভারত পাকিস্তান একে অপরের দেশের উপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ফলে পূর্বে কোলকাতা থেকে যে বিমান পঞ্চাশ মিনিটে আগরতলায় আসত সেটি এখন সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা ঘুরে আসাম জলপাইগুড়ি হয়ে ছয় ঘন্টায় পৌঁছাচ্ছে।

কোলকাতা যাত্রা

ঢাকা থেকে এর আগে কোলকাতা বিমান বন্দরে আমি বহুবার এসেছি কিন্তু এবারের আর পূর্বেকার অনুভূতি দেখলাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আগে এসেছি একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে। টাকার অভাব ছিল না, ভাল না লাগলে যখন ইচ্ছা নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার সুবিধা ছিল, কারো করুণার উপর নির্ভরশীল হতে হতোনা। আর এখন অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন এদেশে এসেছি আশ্রিত হিসেবে। সব সময় একটা অসহায়ভাব মনে বিরাজ

www.pathagar.com

করছিল। কোলকাতায় যে বাসায় উঠব মনস্থ করেছি তারা এ পরিস্থিতিতে আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবে জানি না। পার্ক সার্কাসের তারকদত্ত রোডে রবিউদ্দিন নামে আমার এক বন্ধুর বাসা রয়েছে। সে কয়েক বছর আগে থেকে রোম ইউনিভারসিটিতে বাংলার প্রফেসর হিসাবে কাজ করছিল। বেশীরভাগ সময়ই সে রোমে থাকত বলে জানতাম। এখন কোলকাতায় রয়েছে না রোমে রয়েছে তা জানি না। তবে সে না থাকলেও তার ছোট ভাই রফিক পরিবার নিয়ে সে বাসায় থাকে জানি। তার সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় রয়েছে। তাই রবিউদ্দিন না থাকলেও সেখানে উঠলে অসুবিধা হবে না মনে করে সেখানে উঠব মনস্থ করলাম।

আমার এ বন্ধু রবিউদ্দিন নজরুল নিরাময় কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে অসুস্থ কবি নজরুল ইসলামকে চিকিৎসার জন্য ১৯৫১ সালে ইউরোপ নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু চিকিৎসা শেষে নজরুলকে যখন দেশে ফিরিয়ে আনা হয় তখন কবি ও কবিপত্নির জন্য বিমানের মাত্র দু'টি টিকেট পাঠানো হয়। অর্থাভাবে না অন্য কি কারণে রবিউদ্দিনের জন্য কোন টিকেট না পাঠানোর ফলে তাকে ইউরোপে থেকে যেতে হয়। রবিউদ্দিনের কাছে পরে শুনেছি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় সে ইউরোপে থেকে যেতে বাধ্য হয় এবং তখন উপবাস করে তার মারা যাওয়ার মত অবস্থা দাঁড়ায়। এরূপ সংকটাপন্ন অবস্থায় সে যখন অসহায়ভাবে ভিয়েনার রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন হঠাৎ মিঃ তুসি নামে রোম ইউনিভারসিটির এক প্রফেসারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। মিঃ তুসি এক সময় শান্তি নিকেতনে ইটালিয়ান ভাষার অধ্যাপনার কাজ করতেন এবং সে সময় রবিউদ্দিনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

রবিউদ্দিনের ইংরেজী, বাংলা ও দর্শন শাস্ত্রের উপরে অসাধারণ দখল ছিল। তার ইউনিভারসিটির ডিগ্রী কি ছিল জানি না তবে ইংরেজী, বাংলা ও দর্শন শাস্ত্রে অনার্স ক্লাশের ছাত্রদের তাকে প্রাইভেট পড়াতে আমি দেখেছি। এই তিন বিষয়ের উপরে

www.pathagar.com

তার যে অসাধারণ দখল ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। মোটের উপর কোলকাতার সুধী সমাজে সে যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিল এটা নিশ্চিত। বাংলা কবিতাকে ইংরেজীতে এবং ইংরেজী কবিতাকে বাংলায় রূপান্তর করার ব্যাপারে তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। নিজেও সে ভাল কবিতা লিখতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশ বিভাগের পরে তার নিজের দেশে প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশের জন্য তার প্রতিভার যথাযথ স্বীকৃতি সে পায়নি।

দমদম স্টেশন থেকে বাসে করে বেলা চারটার দিকে ৮/বি তারকদত্ত রোডে তার বাসায় এসে হাজির হলাম। দরজার কড়া নাড়তেই একটু পরে কপালে লাল টিপ দেওয়া গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গি এক সুন্দরী মহিলা এসে দরজা খুলে দিল। আমার পরিচয় দিতেই ভদ্রমহিলা সহাস্যে সাদর সম্ভাষণ করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পরিচয় দিলেন তিনি রবিউদ্দিনের ছোট ভাই রফিকের স্ত্রী। রবি ও রফিকের কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন তখনও রফিক অফিসে রয়েছে এবং রবি এখন রোমে আছে। আমাকে চিনতে পেরেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে বললেন আপনার কথা এদের দু'ভাইয়ের কাছে এতো শুনেছি যে পরিচয় না দিলেও আপনাকে চিনতে কষ্ট হতো না। আমি কয়েকদিন এখানে থাকব একথা বলতে মহিলা বললেন আপনি যতদিন খুশী এখানে থাকতে পারেন কোন অসুবিধা হবে না। ঢাকায় গণ্ডগোলের কথা আমরা আগেই শুনেছি এবং প্রতিদিন আপনার আগমণ প্রত্যাশা করছিলাম। শুনে অনিশ্চয়তার একটা গুরুভার বুক থেকে নেমে গেল।

হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টিয়ে চা খেয়ে বেড়াতে বের হয়ে প্রথমে গেলাম পার্ক সার্কাসে এক বন্ধু আইন জীবির বাসায়। ইনি কোলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং স্থানীয় মুসলমানদের একজন বিশিষ্ট নেতা। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও তৎজনিত কারণে আমার কোলকাতায় আগমণের কথা তাকে

www.pathagar.com

বলতেই তিনি বেশ খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করে বললেন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তোমাদের আলোচনায় ইয়াহিয়া খান তোমাদের ছয় দফার মধ্যে কয়দফা পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিল? আমি খানিকটা ইতস্তত করে বললাম আলোচনার সমস্ত বিষয় আমার জানা নেই তবে যতদূর জানি সাড়ে চার দফা পর্যন্ত মেনেছিল, দেড় দফা মানেনি।

তখন বন্ধুটি রাগ করে বললেন আন্দোলন ও আলোচনার ব্যাপারে তোমাদের নেতারা খুব বাস্তবধর্মী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে বলে তো মনে হয় না। কবে কোথায় শুনেছ যে আলোচনার টেবিলে একপক্ষ আরেক পক্ষের ষোল আনা দাবী মেনে নেয়? ষোল আনা দাবী মেনে নেয় যখন বিজয়ী আর বিজিতের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তোমরা ঢাকায় যখন আলোচনায় বসেছিলে তখন তোমাদের প্রতিপক্ষ কি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত পক্ষ ছিল? সাড়ে চার দফা স্বীকৃতির ভিত্তিতে মিটমাট করে নিয়ে বেশ কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিজের অবস্থা ও শক্তিকে ইতিমধ্যে সতেজ সুসংহত করে পাঁচ বছর পরে আন্দোলনের মারফত বাকী দেড় দফা উসুল করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হতো না? আর কিছুটা দিন অপেক্ষা করতে তোমাদের এমন কি অসুবিধা ছিল? এখন তোমরা নিজেদেরকে ও দেশবাসীকে যে অনিশ্চয়তার মধ্যে এনে ফেলেছ এর শেষ কি ভাবে হবে জানিনা তবে তোমরা যে অত্যন্ত মূর্খের মত কাজ করেছ এতে কোন সন্দেহ নেই।

বন্ধুর কথায় আমি খানিকটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। প্রথম ভেবেছিলাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রচেষ্টাকে এরা খুব আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দিত করবে, কথা বার্তায় আমাদেরকে খুব উৎসাহ দেবে এবং আমাদের চেষ্টাকে জয়যুক্ত করার জন্য সব রকমের প্রতিশ্রুতি দেবে। এ সময়টা ছিল এপ্রিলের শেষ ভাগ তখন সবেমাত্র প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। ভারত আমাদের এ মুক্তিযুদ্ধে কতটুকু সাহায্য দেবে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে

www.pathagar.com

জয়যুক্ত করতে ভারত কতটুকু ঝুঁকি নিতে সাহস করবে, কতটুকু নিজেকে জড়াতে রাজী হবে সবটাই তখন ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ঘটনা প্রবাহ '৭১ এর শেষ পর্যন্ত সমগ্র পরিস্থিতিকে যেখানে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল ইয়াহিয়া খানের '৭১ এর পঁচিশে মার্চের পরে ক্রমাগত ভুল পদক্ষেপ সমূহ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপের পক্ষে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল সেটা এপ্রিলের ঐ সময় কারো পক্ষে আগাম অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তাই ঐ ভদ্রলোকের পক্ষে ওভাবে শঙ্কা প্রকাশ করা খুব অস্বাভাবিক ছিল না।

যে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা কোলকাতায় ছিলাম বরাবরই আমরা লক্ষ্য করেছি কোলকাতার বাঙালী মুসলমানরাও আমাদের এ আন্দোলনকে খুব প্রীতির চোখে দেখেনি। এ আন্দোলনকে পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলন বলেই তারা মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল কোলকাতায় বা পশ্চিম বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হলে কিছুদিনের জন্য হলেও তারা হয়তো পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে গেলে তারা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল না দেখলেও খুব শত্রুভাবাপন্ন দেখিনি। কিন্তু অবাঙ্গালী মুসলমানদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানের বিহারীরা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল তাই কোলকাতার অবাঙ্গালী মুসলমানরাও মনে প্রাণে আমাদের এ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ছিল। আমাদেরকে তারা রীতিমত শত্রুস্থানীয় মনে করতো। বাড়ী ভাড়া করতে গিয়ে দেখেছি যে মুহূর্তে তারা জানতে পারত আমরা পূর্ব পাকিস্তানের লোক তখনি তারা বাড়ী ভাড়া দিতে অস্বীকার করতো। দুই চারজন হয়তো দিতো তবে অনেক ধরাধরি ও চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হতো। আমরা যারা সীমান্তের অপর পারে গিয়ে বাড়ী ভাড়া করে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম সে সব বাড়ী হিন্দুদেরই ছিল। তারা আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকায় আমাদের সাহায্যে সর্ব প্রকারে এগিয়ে আসে।

www.pathagar.com

রাত নয়টার সময় তারকদত্ত রোডের বাসায় যখন ফিরে আসলাম তখন রফিক বাসায় ফিরেছে। আমাকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো। তার বাড়ী যদিও হুগলী জেলায় তথাপি সে বহুদিন যাবৎ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় আমাদের আন্দোলনের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিল এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য মুসলমানদের চাইতে তার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিকেলে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম তার কাছে শুনলাম প্রধান মন্ত্রি তাজউদ্দিন সাহেব তার সহকর্মীদের নিয়ে বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে এক বাড়ীতে থাকেন। খুঁজে খুঁজে পরের দিন বেলা দশটার সময় ঐ বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। গেটে সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে। প্রথমে তারা কিছুতেই ঢুকতে দিতে রাজী হলো না। পরে পরিচয় দিয়ে আধঘন্টা বসে থাকার পর ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। প্রথমে নিচের তলায় দেখা হলো খোন্দকার মোস্তাকের সঙ্গে। দেখে উঠে এসে জড়িয়ে ধরে কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পরে কবে এবং কিভাবে কোলকাতায় এসে পৌঁছেছি সব খবরা-খবর দিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করতে।

তার কামরায় ঢুকতেই দেখি তিনি খাটের উপর বসে আছেন। আমাকে দেখেই খাট থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর চেয়ারে বসতে বলে প্রথম আমাকে যে প্রশ্ন করলেন সেটা হলো রীপির মায়ের খবর কি? রীপি হলো তার বড় মেয়ের নাম। আমি বললাম তিরিশে মার্চ বিকেল বেলায় তার সম্বন্ধি সৈয়দ গোলাম মাওলা সাহেবের বাসায় আমি গিয়ে জানতে পারি আমার পৌঁছানোর ঘন্টাখানেক আগে তিনি তাদের পরিচিত এক লোকের সঙ্গে স্কুটারে করে ডেমরার দিকে চলে গেছেন। তারপর আর তার কোন খবর আমি জানি না। শুনে তাজউদ্দিন সাহেব আমার উপর ভয়ানক চটে গেলেন। আমাকে বারে বারে দোষারোপ করতে লাগলেন আমি কেন রীপির মায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিনি। কার সঙ্গে চলে গেল সে সম্বন্ধে ভালভাবে খোঁজখবর

www.pathagar.com

নেইনি? সেলোক ভালো না মন্দ তাও ঠিক মতো বলতে পারছিনা। বুঝলাম সুদীর্ঘ দিন ধরে তার পরিবারের কোন খোঁজ-খবর জানতে না পেরে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে দিন কাটাচ্ছিলেন। আমি তার পরিবারের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম বলে আমি তাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পারব এ আশাই তিনি মনে মনে পোষণ করছিলেন। কিন্তু আমার কাছ থেকে সে রকম কোন খবর জানতে না পেরে আশা ভঙ্গের দুঃখ বেদনায় খুব মুছড়ে পড়েছেন।

তিরিশে মার্চ বিকেলে আমি সৈয়দ গোলাম মাওলার বাসায় গিয়েছিলাম মিসেস তাজউদ্দিনের খবরের জন্যই। আমার আশা ছিল সেখানে তার দেখা পেলে আমি আমার একান্ত পরিচিত বিশ্বাসী কোন লোকের বাসায় সাময়িকভাবে তার বাস করার ব্যবস্থা করে দেব। যেহেতু তাজউদ্দিন সাহেব প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রি হয়েছেন তাই তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনকে পাক বাহিনীর লোকেরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াবে এবং এমতাবস্থায় খুব কম লোকই তাদেরকে আশ্রয় দিতে সাহস করবে। তাই আমার ঘনিষ্ঠ দুয়েক জায়গায় তাদেরকে লুকিয়ে রাখার কথা চিন্তা করেছিলাম। ঢাকাতে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার তেমন সুবিধা করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত মিসেস তাজউদ্দিনকে আমার নিজের দেশের বাড়ীতে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম। তার পরিচয় গোপন করে ঢাকা থেকে আগত আমার আত্মীয়া হিসাবে দেশের বাড়ীতে রাখলে গ্রামের কোন লোক জানতে পারবে না, ফলে পাক বাহিনীও তার কোন খোঁজ পাবে না। এরূপ মনস্থ করে তার ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে জানতে পারলাম মাত্র আধঘন্টা আগে তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি লোকের সঙ্গে দু'খানি স্কুটার ভাড়া করে ডেমরা ঘাটের দিকে চলে গেছেন। তার ভাই বললো যে লোকটির সঙ্গে গেছে সে তাজউদ্দিন সাহেবের দেশের লোক ও তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মী। যে লোকটির সঙ্গে গিয়েছে তার নাম আমি স্মরণ করতে পারছিলাম না। তাজউদ্দিন সাহেবকে বারে বারে বলছিলাম সে আপনার খুব বিশ্বস্ত কর্মী। তিনি কয়েকটি লোকের নাম বলতেই আমার নামটি মনে পড়ে গেল এবং

www.pathagar.com

বললাম হ্যাঁ এই লোকটির সঙ্গে তিনি গিয়েছেন। তখন তাজউদ্দিন সাহেব খানিকটা আশ্বস্থ হলেন। তথাপি তার মন থেকে সন্দেহ পুরোপুরি দূর হলো না বলে মনে হলো।

যাইহোক তার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করে বুঝতে পারলাম এর মধ্যে তিনি তার মন্ত্রি সভার সদস্যদের নিয়ে দু'একবার দিল্লী গিয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। কিন্তু আমাদের প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে মিসেস গান্ধী তখন পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তার সঙ্গে দেখা হলে ভালো একটা খবর শুনবো বলে আশা করেছিলাম কিন্তু সেটা না হওয়ায় খানিকটা দমে গেলাম।

তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে গল্প করতে করতে তাকে আগরতলায় মুজাফ্ফর এম,পিকে আমার পায়জামাটি দেওয়ার কথা বলতে তিনি বললেন যদি সম্ভব হয় আমাকে গোটা দুই তিনেক পাঞ্জাবী পায়জামা দিয়ে যান। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম তিনি ঠাট্টা করছেন। পরে বুঝলাম তা নয়। তাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত তখন ভারত সরকার করে দিলেও কাপড় চোপড় তৈরী বা হাত খরচের জন্য তখনও কোন টাকা পয়সা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়নি। তাজউদ্দিন সাহেব বললেন তার মাত্র দুটি পায়জামা ও দুটি পাঞ্জাবী আছে। এতে চলে না আরও কিছু কাপড় চোপড়ের দরকার। বাংলাদেশে সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা তখনও গড়ে উঠেনি - তাই আমাদের সীমান্তের এপারে স্টেটব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা হতে ওপারে নিয়ে যাওয়া কয়েক কোটি টাকা অফিসিয়ালী ভাঙ্গাবার তখনও কোন বন্দোবস্ত হয়নি। তাই তাজ উদ্দিন সাহেব ও তার সহকর্মীরা ব্যক্তিগতভাবে যে কিছু টাকা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার উপরই তাদের নির্ভর করতে হচ্ছিল। তাই কারো হাতেই তেমন টাকা কড়ি ছিল না। পান সিগারেটের খরচও তাই সবাইকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখতে হচ্ছিল। পরে অবশ্য যখন

www.pathagar.com

আমাদের নিয়ে যাওয়া টাকা ভারত সরকার কিনে নিলেন তখন আর এ কৃচ্ছতা পালনের প্রয়োজন হয়নি।

যা হউক তাজউদ্দিন সাহেব পাঞ্জাবীর কথা বলতে আমি বললাম দেখি কি করা যায়, দু'চারটা জামা আপনাকে হয়তো আমি জোগাড় করে দিতে পারব। এই বলে সেদিন চলে এলাম। এর কয়েকদিন পরে চারটি পাঞ্জাবী ও চারটি পায়জামা তৈরী করিয়ে তাজউদ্দিন সাহেবকে দিয়ে এলাম। তিনি খুব খুশী হলেন। আমি ঢাকা থেকে যে সাতশ টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম তার কিছুটা অংশ ভাঙ্গিয়ে আগরতলা থেকে কোলকাতার টিকেট কিনেছিলাম। বাকী অংশ শিয়ালদহ বাজারে গিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিলাম। এতদিনে টাকার বিনিময়ে হারটা সঠিক মনে পড়ছে না তবে পাকিস্তানী টাকার বিনিময় শতে পাঁচ টাকা বেশী পেয়েছিলাম বলেই মনে পড়ে। এতদিন পরে সেদিনের মুদ্রা মানের কথা লিখতে গিয়ে যখন আজকের দিনে বাংলাদেশের একশত টাকার বিনিময়ে ভারতীয় ৪২ টাকা পাওয়া যায় দেখি তখন মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে যায়। যেদিন তাজউদ্দিন সাহেবকে পাঞ্জাবী দিতে গেলাম সেদিন শুনলাম আগামীকাল তাঁরা দিল্লী যাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। তখন আমাদের কেন জানি মনে হচ্ছিল ভারত সরকার স্বীকৃতি দিলেই আমাদের গুনগত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক হিসাবে একটা আলাদা মর্যাদার অধিকারী হবো। পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন ফোরামে কথা বলবার আমাদের সুযোগ ঘটবে, তাতে আমাদের স্বাধীনতা কিছুটা তরান্বিত হবে। তাই ভারত সরকার কর্তৃক আমাদেরকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছিলাম। আগামীকাল তাঁরা দিল্লী যাবেন যখন শুনলাম মনটা খুশীতে ভরে গেল।

কোলকাতা পৌঁছার দু'তিনদিন পরেই জানতে পারলাম পার্ক সার্কাস মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে বালুহক্কাক লেনের একটি একতলা

www.pathagar.com

বাড়ীতে জয়বাংলা পত্রিকার অফিস খুলবার আয়োজন চলছে। সেখানে গিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা মান্নান ভাই, যশোহরের মাহমুদুল্লাহ চৌধুরী, এম, আর, আকতার মুকুল ও আওয়ামী লীগের অনেক কর্মীর সঙ্গে দেখা হলো। প্রেসের মালিক হিসেবে মুদ্রন সম্পর্কে আমার যেহেতু বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে তাই কাগজ বের করার ব্যাপারে মান্নান ভাই আমাকে পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিলেন। মান্নান ভাই পত্রিকার সামগ্রিক দেখা শোনার দায়িত্বে ছিলেন আর যশোরের মাহমুদুল্লাহ চৌধুরী সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। "জয়বাংলা" পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। এটি ডবল ডিমাই সাইজে আট পৃষ্টার নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা হতো। আমার কাজ ছিল প্রুপ দেখা। বাংলাদেশ থেকে যে সব কর্মী কোলকাতায় পৌছাচ্ছিল তাদের সঙ্গে আলাপ করে কিছু কিছু নিউজ তৈরী করা। হ্যারিসন রোডটি পার হয়ে মির্জাপুর রোড যেখানে কলেজ স্কোয়ারে এসে সংযুক্ত হয়েছিল এরই কাছাকাছি একটা ছোট গলিতে একটি প্রেসে পত্রিকাটি ছাপা হতো।

পত্রিকাটি ছাপার উপলক্ষ্যে আমাকে সপ্তাহে দু'তিনদিন ঘন্টা তিনেক করে ঐ প্রেসে কাটাতে হতো। ঐ প্রেসের মালিক ছিল একজন মধ্যবয়সী হিন্দু মহিলা। আর অধিকাংশ কম্পোজিটরই ছিল মেয়ে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছাপা খানায় মেয়েদের মেশিনে ও কম্পোজিশন সেকশনে ইতিপূর্বে আমি কাজ করতে দেখেছি। কিন্তু কম্পোজিশান বিভাগে সব মেশিনই ছিল অটোমেটিক, হাতে সীসার টাইপে কম্পোজ করতে দেখি নাই। কিন্তু কলিকাতায় এ প্রেসে দেখলাম সবাই সীসার টাইপে কম্পোজ করছে। সীসা একটি বিষাক্ত ধাতু, ক্রমাগত এই টাইপ হাতে নাড়াচাড়া করার ফলে এই বিষ সুক্ষ্ম ভাবে কিছুটা শরীরে প্রবেশ করে জীবনীশক্তি নষ্ট করে দেয়। বহুদিন ছাপা খানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার ফলে এ অভিজ্ঞতা আমার আগে থেকে রয়েছে। আমার নিজের ও বন্ধু বান্ধবদের ছাপা খানায় কম্পোজিশন ডিপার্টমেন্টে স্বাস্থ্যবান লোক আমি কমই দেখেছি। আলোচ্য ছাপা খানাটিতেও দেখলাম মহিলা

www.pathagar.com

কম্পোজিটারদের অধিকাংশই রুগ্ন এবং শ্রীহীনা। স্বাস্থ্যবান এবং লাবণ্যময়ী খুব কম মেয়েকে সেখানে দেখেছি বলে মনে পড়ে। আমার বেশ মনে হলো সীসার সংস্পর্শেই বোধ হয় এদের এ অবস্থা। পরে জানতে পারলাম কোলকাতার অধিকাংশ প্রেসের কম্পোজ বিভাগে পুরুষের তুলনায় মেয়েরাই বেশী কাজ করছে। পশ্চিম বঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জীবন সংগ্রাম যে কত তীব্র এর থেকে তার কিছুটা আঁচ করতে পারলাম। মেয়েরা ইউনিয়ন করে না, পান সিগারেট খাওয়ার অজুহাতে বারে বারে বাইরে গিয়ে কাজে ফাঁকি দেয় না বলে এসব প্রেসে মালিক কর্তৃক নারী শ্রমিক নিয়োগের এটাও বোধ হয় একটা প্রধান কারণ।

বালুহক্কাক লেনে জয়বাংলা পত্রিকার সঙ্গে আরও অনেকে এসে পরবর্তীকালে যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, সলিমউল্লা, আনু মহম্মদের নাম আমার বেশ মনে আছে। জয় বাংলা পত্রিকাটি সম্পাদনার ব্যাপারে সব চাইতে মনপ্রাণ ও নিষ্ঠার সঙ্গে যিনি কাজ করছিলেন তিনি হলেন মুহম্মদ উল্লাহ। ইনি পচিশে মার্চের আগে পূর্ব পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্লি ভবনের একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। এরূপ হাসিখুশী, কর্মদক্ষ, সাচ্চা দেশ প্রেমিক ও নিবেদিত প্রাণ মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐ কয়মাসে আমি খুব কমই দেখেছি। প্রতিদিন পত্রিকার জন্য দশ বার ঘন্টা ইনি পরিশ্রম করতেন। দূর্ভাগ্যবশতঃ দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। শুনেছি স্বাধীনতার পরে অনেকে অনেক সুবিধা লাভ করতে পারলেও তার পক্ষে কোন সুবিধা লাভ ঘটেনি। বালুহাক্কাক লেনে এ সময় মশার দৌরাত্ব ছিল অসম্ভব রকম। মহম্মদ উল্লাহ ভাই একদিন আমাকে বললেন মশার কামড়ে রাত্রে ঘুমাতে পারছি না। একটি মশারী জোগাড় হয়েছে কিন্তু তার নীচে দু'তিনজনকে ঘুমাতে হয় বলে প্রচুর মশা ঢুকার ফলে ভাল করে কারো ঘুম হয় না। তারকদত্ত রোডে যে বাসায় আমি উঠেছি সেখানে আমাকে মশারী দেওয়া হয়েছে বলে ঢাকা

www.pathagar.com

থেকে সঙ্গে যে মশারীটি নিয়ে গিয়েছিলাম তার আর প্রয়োজন ছিল না। সে মশারীটি পরদিন মহম্মদ উল্লাকে দেওয়ায় তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। মশারিটি ছিল নেটের তাই ফ্যানের হাওয়া সহজে ঢুকতে পারত বলে ঘুমানোর পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। কথা ছিল প্রয়োজন ফুরালে মশারীটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন কিন্তু কয়েকমাস পরে মহম্মদ উল্লার কাছ থেকে মশারীটি অন্য একজন নিয়ে যায় যার কাছ থেকে সেটা আর পাওয়া যায়নি।

মে মাসের মাঝামাঝি একদিন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে আবার গেলাম। শুনলাম তার আগের দিন তাজউদ্দিন সাহেব ও তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা দিল্লী থেকে ফিরেছেন। প্রথমে দোতলায় খোন্দকার মোস্তাকের কামরায় গেলাম। দেখি তিনি চুপচাপ গম্ভীর ভাবে বসে আছেন। তার কাছে দিল্লী সফরের ফলাফল জানতে চাইলে তিনি রাগে তুবড়ীর মত ফেটে পড়লেন। তিনি বললেন, কি করে আশা করেন যে আমরা ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে আনতে পারব? ইন্দিরা গান্ধী আমাদের যখন জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের যুদ্ধের স্ট্যাটিজিটা আমাকে বুঝিয়ে বলুন - যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি ধরা দিয়েছেন আর আপনাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন এটা কোন ধরণের রণকৌশল? আমরা একথার কোন জওয়াব দিতে পারিনি। ২৫ তারিখ রাত্রে শেখ সাহেবের পাক সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের সমর্থনে আমরা কোন যুক্তিই দেখাতে পারিনি। ইন্দিরা গান্ধী যখন বারে বারে বলছিলেন ভূ-ভারতে কে কোথায় শুনেছে যে যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি শত্রুপক্ষের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়? আপনারা প্রথম প্রথম বলেছিলেন তিনি ২৫শে মার্চ রাত্রেই গৃহত্যাগ করেছেন এবং সহসাই আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। পরে দেখা গেল আপনাদের সে কথা ঠিক নয়। তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন এটা যুদ্ধের কোন ধরণের কৌশল আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আমরা সবাই তখন লা জওয়াব হয়ে গেলাম উত্তর দেওয়ার আমাদের কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য

www.pathagar.com

আমরা কিভাবে পীড়াপীড়ি করতে পারি? তাই খালি হাতেই আমাদের ফিরে আসতে হয়েছে। বুঝলাম পঁচিশে মার্চের রাত্রিতে শেখ সাহেবের ধরা দেওয়াকে তিনি অত্যন্ত ভুল ও অবিবেচনার কাজ বলে মনে করে রাগে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে আছেন।

শেখ সাহেবের এভাবে সেদিন রাত্রে ধরা দেওয়াকে আমিও কোনদিন মনের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে খাপ খাওয়াতে পারিনি। অন্যেরা যে যাই বলুক আমার নিজের ধারণা আওয়ামী লীগের নেতারা তাজউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে এভাবে দেশ স্বাধীন করবে এটা তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল পাকবাহিনী অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে। বেশ কিছু নেতা ও উপনেতাকে হত্যা করবে। দশ-বিশ হাজার কর্মীকেও হত্যা করে সাময়িকভাবে দেশের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিলেও শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে না। আগরতলা কেসের সময় তাঁকে যেভাবে দেশের মানুষ আন্দোলন করে জেল থেকে বের করে এনেছিল সেভাবে দু'তিন বছর পরে তুমুল আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হবে।

জীবনে তিনি কোনদিনই আত্মগোপনের রাজনীতি করেননি, এ জীবন অত্যন্ত কষ্টকর ও বিপদসংকুল যার সম্পর্কে তাঁর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তিনি ধরা দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাজউদ্দিন ও অন্যান্য নেতারা আত্মগোপন করে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন ধরা পড়লে পাকবাহিনী তাদেরকে খুব সম্ভব হত্যা করবে, আর তাদেরকে হত্যা করলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়াও হবে না। কিন্তু তাদেরকে হত্যা করলেই শেখ সাহেব ও তাঁর প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। ফলে আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হবে। সমস্ত ডালপালা কেটে ফেললে কাণ্ড যেমন শুকিয়ে যায় এটা অনেকটা সে রকম। শেখ সাহেব যেহেতু এত বড় একটা

www.pathagar.com

বিজয়ী দলের অবিসংবাদিত নেতা তাই তাঁকে হত্যা করতে পাকিস্তান সরকার সাহস না করলেও অন্যান্য নেতাদের হত্যা করে শেখ সাহেবকে দুর্বল ও অক্ষম করে দিতে দ্বিধা করবে না। তাই তাজউদ্দিন ও অন্যান্য নেতারা পলায়নই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

সেদিন শেখ সাহেবের ধরা দেওয়া সমগ্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ভাল কি মন্দ হয়েছিল সে সম্পর্কে আমি আজও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। শেখ সাহেব ধরা না দিয়ে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব দিলে পরবর্তীকালে মুজিবনগরে আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, যেটা স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রস্তুতিকে ঐ নয় মাস যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করে তাঁর পরিচালনাকে ভারতের উপর অনেকটা নির্ভরশীল করে তুলেছিল সেটা হতে পারত না। শেখ সাহেবের উপস্থিতিতে উপদলীয় কোন্দল সম্ভব হতো না বলে ভারতে অবস্থানকালীন ঐ নয় মাস প্রবাসী সরকার আরো স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পেত। নিজেদের মধ্যে ঐক্যমতের অভাবে ভারতীয় সিদ্ধান্ত যেভাবে প্রবাসী সরকারকে নানা ব্যাপারে অনেকক্ষেত্রে মেনে নিতে হতো তার অবকাশ আর ঘটতো না। এ ছাড়া স্বাধীনতাউত্তরকালে তাজউদ্দিন সাহেব ও শেখ সাহেবের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দেয় যা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের জন্য পরবর্তীকালে অশেষ ক্ষতির কারণ হয়েছিল তাও দেখা দেওয়ার কোন সুযোগ হতো না। যুদ্ধকালীন ঐ সময়ে কার অবদান কতটুকু ছিল এ সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা থাকতো বলে পরবর্তীকালে তিনি যেভাবে কান কথার শিকার হয়েছিলেন তাও ঘটতো না।

কিন্তু এ চিত্রের আরো একটা দিক রয়েছে যেটাও আমার চিন্তাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। ঐ নয় মাস ভারতের বুকে থাকলে পরবর্তীকালে শেখ সাহেব আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যতটা স্বাধীন নীতি ও বলিষ্ঠ কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন তা কি তিনি গ্রহণ করতে পারতেন? স্থান, কাল, মাহাত্মের প্রভাব বলে একটা কথা আছে। শেখ সাহেব অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা

www.pathagar.com

মানুষ ছিলেন। ঐ নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রস্তুতি, অস্ত্র সরবরাহ ইত্যাদি জটিল ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী সরকারের অনেক সময় মতদ্বৈধতা দেখা দিত যেটা তাজউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত ধীর-স্থির প্রকৃতির মানুষ বলে কোনভাবে সামাল দিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে স্থান, কাল, সময়ও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যেটা নির্ধারণের ব্যাপারে শেখ সাহেব ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতামত ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে কতটুকু একমত সবসময় হতে পারতেন বলা শক্ত। তাতে কোন কোন সময় অচল অবস্থাও দেখা দিয়ে বিপর্যয় ঘটতে পারত।

পঁচিশে মার্চের রাত্রে ধরা দেওয়ার প্রধান কারণ যে শেখ সাহেবের আন্ডারগ্রাউণ্ড জীবনের দুঃখ-কষ্ট এড়ানোর জন্য এটা আমার স্থিরবিশ্বাস। সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁর তেমন বিশ্বাস ছিল না। তাঁর বাসায় গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হলে তাঁকে কখনো খুব উৎসাহিত হতে দেখিনি। তাঁর গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন। '৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একবার মাত্র দু'দিনের জন্য তাঁকে সন্ধ্যার পর আত্মগোপন করে অন্যত্র রাত্রিযাপন করতে আমি দেখেছি। ঐ সময়ে একদিন দুপুরে তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে টেলিফোনে সন্ধ্যায় গাড়ী নিয়ে তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। সেখানে গেলে ছোট একটি সুটকেস হাতে তিনি তাঁকে ফতুল্লায় আওয়ামী লীগের ট্রেজারার প্রফেসার হামিদের কোল্ড স্টোরেজ "হিমাগার"-এ পৌঁছে দিতে বললেন। আমি গাড়ী চালাচ্ছিলাম। ড্রাইভার আনতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। যেতে যেতে তিনি বললেন কোন গোপন সূত্রে তাঁরা খবর পেয়েছেন যে শেখ সাহেব ও তাঁকে সেদিন রাত্রে গ্রেফতার করা হতে পারে। তাই রাত্রে তাঁরা বাসায় থাকবেন না। অন্য একটি গাড়ী শেখ সাহেবকেও তাঁর বাসা থেকে "হিমাগারে" নিয়ে আসবে। হিমাগারটি ছিল ঠিক বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে। যদি তাদেরকে হিমাগারে গ্রেফতার করার চেষ্টা হয় তবে একটি লঞ্চ সেখানে সর্বক্ষণ বাঁধা ছিল যাতে করে তাঁরা

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের দিকে পাড়ি জমাতে পারেন। আমি জানি শেখ সাহেব গ্রেফতার এড়াবার জন্য শুধু দুই রাত্রি গৃহের বাইরে কাটিয়েছিলেন, পরে আর কখনো যাননি।

কোলকাতা পৌঁছানোর পর সপ্তাহ দু'তিনেক আমি এদিক-ওদিক ঘুরে পরিচিতদের মধ্যে যারা যারা কোলকাতা পৌঁছেছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগলাম। তাঁর মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন জেলার এম, পি, এ ও এম, এন, এ'রা। এর মধ্যে তাজউদ্দিন সাহেব, তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীত্রয়, একটিং প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ী ছেড়ে আট নম্বর থিয়েটার রোডের একটি বড় দোতলা বাড়ীতে এসে উঠলেন। এই বাড়ীর নীচতলায় ছোট দু'টি কামরা নিয়ে তাজউদ্দিন সাহেব থাকতেন। একটি তাঁর শয়নকক্ষ ও অপরটি তাঁর অফিস কামরা ছিল। দর্শন প্রার্থীরা পাশে একটি ছোট বারান্দায় বসতো। উপরতলায় কয়েকটি কামরায় জনাচল্লিশেক এম, পি, এ ও এম, এন, এ ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ থাকতেন। এ বাড়ীতে একটি মেস খোলা হয়েছিল যেখান থেকে তাজউদ্দিন সাহেব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের খাবার সরবরাহ করা হতো।

আমি ঘুরে ঘুরে এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অনেকের মধ্যে একটা হতাশার ভাব লক্ষ্য করলাম। আমাদের ভবিষ্যৎ কি, মুক্তিযুদ্ধ সফল হবে কি, কতদিনে ঘরে ফিরতে পারব এ সমস্ত চিন্তায় প্রায় সবার মন ভারাক্রান্ত। আমিও মনে মনে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। বারে বারে মনে হচ্ছিল একি হলো শেষ পর্যন্ত? কোথায় ভোটে জিতে দেশ পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ শাসন করব, না তার বদলে কোলকাতার রাস্তায় লক্ষ্যহীন-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঢাকায় আমার প্রেসটির এখন কি অবস্থা কিছুই জানতে পারছিলাম না। এই প্রেসটির আয়ের উপরে আমাদের তিন-চার ভাইয়ের পরিবারের ভরণ-পোষণ চলতো। ভরসা ছিল ভাইয়েরা যখন আছে তখন কোন রকমে প্রেসটি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তাতে হয়তো কাউকে অনাহারে থাকতে হবে না। আমার

www.pathagar.com

পরিবারকে সঙ্গে আনিনি। তারা ঢাকায় আমার মগবাজারের বাসায় রয়ে গিয়েছিল। আমার ভাইয়েরা যখন রয়েছে, তখন আমার পরিবারের তেমন অসুবিধা হবে না এটাই আমার বিশ্বাস ছিল। আমার অনুপস্থিতিতে সবাই তাকে আরো বেশী খাতির-যত্ন করে রাখবে এটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতার পরে গিয়ে জানতে পারলাম ঐ নয় মাস আমার পরিবার অত্যন্ত দুঃখ ও মনঃকষ্টের ভিতর দিয়ে দিন কাটিয়েছে। আওয়ামী লীগের এম, পি'র স্ত্রী হিসেবে আমার স্ত্রীকে সবাই ভীতির চোখে দেখতো, সবাই এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতো। আমি বাসা ত্যাগ করার দু'দিন পরেই পাক আর্মি আমার খোঁজে বাসায় এসেছিল। এরপরেও আবার আসতে পারে এই ভয়ে আমার স্ত্রী আমার তিন ছেলেকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাসায় চলে যায়। আমার তিন ছেলে -- বড়টির বয়স তখন কুড়ি/একুশ, দ্বিতীয়টি আঠার/উনিশ এবং ছোটটির প্রায় পনর/ষোল বৎসর। তাদেরকে পেলে ধরে নিয়ে যাবে এই ভয়ে আমার স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছিল।

আমার অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন তাদেরকে বোঝা মনে করবে এটা ভাবতে পারলে আমি কোলকাতা পৌঁছার পর যেভাবে হয় তাদেরকে কোলকাতায় আনিয়ে নিতাম। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতি হবে এটা ভাবতে পারিনি বলে সে চেষ্টা করিনি। এ ছাড়া আমার ধারণা ছিল দু'চার মাসের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক চাপের ফলে ইয়াহিয়া খানের শুভবুদ্ধি ফিরে আসবে। বাংলাদেশে তাদের অসহায় অবস্থা তখন উপলব্ধি করে শেখ সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় আসবার চেষ্টা করবে। শেখ সাহেবকে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই মুক্তিযুদ্ধ থেমে যাবে এবং আমরা বাড়ী ফিরে যেতে পারব এই ধারণাতেই আমার পরিবারকে কোলকাতায় নিয়ে আসার কথা ভাবিনি। পরে জানতে পেরেছিলাম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আমার একমাত্র ভগ্নিপতি অবসরপ্রাপ্ত এস, পি আবদুল খালেক সাহেবই আমার স্ত্রী ও সন্তানদের বেশ কিছুটা আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তবে এক

www.pathagar.com

বাসায় বেশীদিন থাকা ঠিক হবে না বিবেচনা করে তারা সব সময় সেখানে থাকতো না।

১৭ই এপ্রিল '৭১ তারিখে বাংলাদেশ সীমান্তে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের আম্রকাননে যে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তাতে তাজউদ্দিন সাহেব প্রধানমন্ত্রী, কামরুজ্জামান সাহেব রিলিফ, পুনর্বাসন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মনসুর আলী সাহেব অর্থমন্ত্রী ও খোন্দকার মোস্তাক আহমদ পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া টাঙ্গাইলের এম, এন, এ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নানকে বেতার, তথ্য ও প্রচার বিভাগের সামগ্রিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। মেহেরপুরের আম্রকাননে মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণ করান দিনাজপুরের এম, এন, এ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা প্রফেসর ইউসুফ আলী।

তাজউদ্দিন সাহেব অতঃপর সরকার পরিচালনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত চারজনকে সচিব নিযুক্ত করেন ঃ

খোন্দকার আসাদুজ্জামান	–	অর্থ সচিব
তওফিক ইমাম	–	মন্ত্রী পরিষদ সচিব
আবদুস সামাদ	–	প্রতিরক্ষা সচিব
নূরুল কাদের খান	–	সংস্থাপন সচিব

সরকার গঠনের পর পরই একটা শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে উপরোক্ত সচিবেরা প্রথমাবধি যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন তা অতীব প্রশংসনীয়। এদেরকে তখন অন্তহীন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। ক্রমাগত উদ্বাস্তুদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপও বেড়ে যাচ্ছিল। ফলে এদেরকে দৈনিক বার-চৌদ্দ ঘন্টা কাজ করতে হচ্ছিল।

উপরোক্ত চারজন সচিব নিযুক্ত করা ছাড়াও কয়েকদিন পরে কাজের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে দশটি জোনে ভাগ করে নির্বাচিত

www.pathagar.com

সদস্যদের তত্ত্বাবধানে দশটি জোনাল অফিস স্থাপন করা হয়। অফিসগুলি নিম্নলিখিত সদস্যদের সার্বিক দায়িত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

১। দক্ষিণ পূর্ব জোন--(ক) প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী
২। দক্ষিণ পূর্ব জোন--(খ) জহুর আহম্মদ চৌধুরী
৩। দক্ষিণ পশ্চিম জোন--(ক) এম, এ, রউফ চৌধুরী
৪। দক্ষিণ পশ্চিম জোন--(খ) ফনি মজুমদার
৫। পশ্চিম জোন--(ক) আজিজুর রহমান
৬। পশ্চিম জোন--(খ) আশরাফুল ইসলাম
৭। উত্তর জোন--মতিউর রহমান
৮। উত্তর পূর্ব জোন--(ক) দেওয়ান ফরিদ গাজি
৯। উত্তর পূর্ব জোন--(খ) শামসুর রহমান খান
১০। পূর্ব জোন -- লেঃ কর্নেল এম, এ, রব

এদের উপর বহুবিধ দায়িত্বের মধ্যে প্রধানত ছিল মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত সেক্টর কমাণ্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলি পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন ও তাদের ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করা। জোনাল অফিসগুলির আরও দায়িত্ব ছিল শরণার্থীদের দেখাশোনা, তাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং সীমান্তের অপর পার থেকে আগত সরকারী কর্মচারীদের নাম, ধাম, পদবী তালিকাভুক্ত করে কর্মে নিযুক্ত করা। কিছুদিন পরে ঢাকা ও লণ্ডন থেকে আরও কিছু অফিসার এসে হাজির হলেন; তন্মধ্যে তিনজনকে সচিব হিসাবে নিযুক্ত করা হলো। এঁরা হলেন ঃ

মুখ্য সচিব	–	রুহুল কুদ্দুস
পররাষ্ট্র সচিব	–	মাহবুবুল আলম চাষী
তথ্য ও বেতার সচিব	–	আনোয়ারুল হক খান

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা বাছাইয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ

ইতিমধ্যে কয়েকজন সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে আলাপ করে জানলাম যে ট্রেনিংয়ের জন্য মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার ও পার্টির মধ্যে বেশ কিছুটা মতভেদ দেখা দিয়াছে। ছাত্রলীগ ছাড়াও ছাত্র ইউনিয়নের বহু যুবক ও ছাত্র সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্যাম্পে হাজির হয়ে ট্রেনিং নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা শুধু আওয়ামী লীগ নেতাদের একান্ত বিশ্বাসভাজন যুবকেরাই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করবে, ন্যাপ বা অন্যান্য বামপন্থী দলের সদস্যরা নয়। আওয়ামী লীগ চরিত্রগতভাবে যেহেতু বুর্জোয়া পার্টির অনুরূপ ছিল তাই শুধু তাদের অনুগত লোকেরা ট্রেনিং নিক এটা ভারত সরকারেরও ইচ্ছা ছিল। বামপন্থীদের মধ্যে তিন ধরনের যুবক ছিল। একদল ছিল মস্কোপন্থী, কিছুসংখ্যক ছিল চীনপন্থী এবং অপর একটি ছিল ঘোরতর জাতীয়তাবাদী কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রথম দলের ট্রেনিং গ্রহণে ভারতের তেমন আপত্তি ছিল না কিন্তু অপর দুইদলের ব্যাপারে ভারতের বেশ আপত্তি ছিল। এসময় দেখা গেল আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের উপযুক্ত রকম ও প্রয়োজন অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত ভারত সরকারের লোকেরা সরবরাহ করছে না। তাজউদ্দিন সাহেবও আভাস-ইঙ্গিতে অনেক সময় এ ধারণা দিতেন। ভারতের আমেরিকাপন্থী প্রধানত যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশের বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই প্রথমাবধি ইন্দিরা গান্ধীর মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনের নীতির বিরোধী ছিল। তাদের প্রথম ভয় ছিল চীন-আমেরিকার সমর্থনে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেলে ভারত অভাবনীয় বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। তাদের দ্বিতীয় ভয় ছিল ভারতের পাশেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম পুঁজিবাদী ভারতের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তৃতীয় ভয় দেখা দিল ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে। এই চুক্তির ফলে ভারত অধিক থেকে অধিকতরভাবে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়বে অর্থাৎ পুঁজিবাদী

www.pathagar.com

ভারতে সোভিয়েত ভাবধারার প্রভাব অসম্ভব বৃদ্ধি পাবে। উপরোক্ত কারণগুলি ডানপন্থী রাজনীতিকদের দারুণভাবে চিন্তিত করে। তারা তাদের সমর্থক মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় প্রশাসনিক ও সামরিক অফিসারদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রচেষ্টায় যতদূর সম্ভব প্রথমাবধি বাধার সৃষ্টি করছিল। এদেরই ইঙ্গিতে উন্নতমানের অস্ত্রের পরিবর্তে অনেকসময় নিম্নমানের অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করা হতো। অনেকসময় দেখা গেছে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরিত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সংখ্যানুপাতে যে পরিমাণ ও যে ধরনের অস্ত্র দেওয়া প্রয়োজন ছিল তার চাইতে অনেক কম দেওয়া হয়েছে। ফলে অপারেশন করতে গিয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অনেকসময় অহেতুক ক্ষতির সম্মুখীন হতো। এ ব্যাপারটি তাজউদ্দিন সাহেবেরও অগোচরে ছিল না। আমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে তিনি একথাটা অনেকসময় স্বীকার করতেন। দুঃখ করে অনেকসময় বলতেন দিল্লী সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে প্রথম কয়েকমাস সঠিকমানের অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছিল না এবং দিল্লীর নির্দেশ নানা ছলছুতায় সীমান্তের সামরিক অফিসাররা সঠিকভাবে পালনও করছিল না।

'৭১ এর প্রথমাবধি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে বেশ কিছু জায়গায় নকসাল আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রের একটা অংশ নকসালীদের হাতে গিয়ে পড়ে কিনা এই ভয়ে ভারত সরকার সম্ভবত উদ্বিগ্ন ছিল। তাছাড়া আসামের নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের হাতে এ অস্ত্রের কিছু অংশ পাচার হয় কিনা সে ভয়ও ছিল। এসব কারণেই খুব সম্ভবত অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে খুব কার্পণ্য করা হচ্ছিল। অনেক সময়ই প্রয়োজনের তুলনায় কম ও নিম্নমানের অস্ত্র দেওয়া হতো। এতে প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি বেশী হতো। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিতে লাগল। এসব ব্যাপার ঘটছিল জুন-জুলাই পর্যন্ত। আরো একটা কারণ বোধ হয় এই ছিল যে ভারত বাংলাদেশের ব্যাপার নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে কতটুকু নিজকে জড়াবে সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে

www.pathagar.com

পারছিল না। সমস্ত আন্দোলনকে চূর্ণ করে দিয়ে সামরিক জান্তা পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে নিয়ে আসুক এটা ভারত সরকার চাচ্ছিল না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক এটাও ভারত সরকারের কাম্য ছিল না। প্রথম দিকে তাই বেশী ঝুঁকি না নিয়ে সীমিত সাহায্যের মারফৎ বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করে যাওয়ার নীতিই ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল। এ সমস্ত কারণেই মুক্তিযোদ্ধা বাছাই ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ভারতীয় নীতি প্রথম দিকে বেশ খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল মনে হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাস দেড়েক পর্যন্ত আগরতলা-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি একটি জায়গা থেকে এক কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সফরমার থেকে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রচারকার্য চালানো হতো। ২৫শে মে থেকে ভারত সরকারের সাহায্যে সীমান্তের কাছাকাছি এক স্থান থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পঞ্চাশ কিলোওয়াটের একটি শক্তিশালী বেতার স্টেশন স্থাপিত হয়। বালিগঞ্জের সার্কুলার রোডে যে বাড়ীতে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথম দিকে থাকতেন পরে তাঁরা থিয়েটার রোড ও সি, আই, টি রোডে চলে যাওয়ার পর ঐ বাড়ীটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের বাসস্থান ও রেকর্ডিং রুম হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এখানে সমস্ত প্রোগ্রাম টেপে রেকর্ডিং করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তা বহন করে বেতার কেন্দ্রে নিয়ে রিলে করা হতো। এই বেতার কেন্দ্রের প্রোগ্রামগুলির মধ্যে সবচাইতে আকর্ষণীয় এম, আর, আখতার মুকুলের স্বলিখিত ও পঠিত "চরমপত্র" প্রোগ্রামটি পশ্চিম বঙ্গে ও বাংলাদেশের ভিতরে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সীমান্তের বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে, মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটিতে, উদ্বাস্তু শিবিরে মানুষের মনোবল রক্ষা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির ব্যাপারে এর অবদান ছিল অতুলনীয়।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে শুনেছি এখানকার বাঙ্গালীরাও চুপে চুপে গোপনে এই প্রোগ্রামটি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শুনতো।

"চরমপত্র" ছাড়াও কতকগুলি দেশাত্মবোধক গান এ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতো, যেগুলি রচনা ও সুরের দিক থেকে ছিল অনবদ্য ও মধুর, যেগুলি সীমান্তের অপর পারে আশ্রয় গ্রহণকারী আমাদের সবাইকে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করতো ও দেশের মাটির সঙ্গে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখতে সাহায্য করতো। এসমস্ত গানের অধিকাংশই লিখিত ও রেকর্ডকৃত হয়েছিল পহেলা মার্চের পর অসহযোগ আন্দোলনের সময়। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন শিল্পী, টেকনিশিয়ান যারা দেশ ত্যাগ করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাই এসব টেপ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সে সময়ে জাতি, ধর্ম, বয়স, পেশা, মতবাদ নির্বিশেষে অধিকাংশ বাংলাদেশের মানুষ দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের কোন্ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল আজ তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। এই উৎসর্গিতপ্রাণ ব্যক্তিদের অনেকে হয়তো নিজ জীবনে স্বাধীনতাই দেখে যেতে পারে নি। তাদের সন্তান-সন্ততিরাও আজ তাদের পিতা-মাতার জীবন উৎসর্গের ফলে অর্জিত স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা কতটুকু উপভোগ করতে পারছে বলা কঠিন।

সঙ্গীত ছাড়াও জল্লাদের দরবার নামে নিয়মিত নাটক ও বিভিন্ন কথিকা আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম ছিল। সেই নয় মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তথ্য, প্রচার, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম ও জয়বাংলা পত্রিকায় নিয়মিত লেখা দিয়ে যারা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ডঃ আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান, ফয়েজ আহমদ, গফ্ফার চৌধুরী, কবি আসাদ চৌধুরী, সলিমুল্লাহ, ডঃ ইবনে গোলাম সামাদ, গাজিউল হক, মহাদেব সাহা, সিকান্দার আবু জাফর, শওকত ওসমান, জহির রায়হান প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের লেখা, অভিনয়, গান, আবৃত্তি স্বাধীন বাংলা বেতারের মানকে অত্যন্ত সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত হতে সাহায্য

www.pathagar.com

করে, যার ফলে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের চোখে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী আমাদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নাটকে অংশগ্রহণ করে যারা এই বিভাগকে সফল করে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে হাসান ইমাম, মাধুরী চৌধুরী, সুভাষ দত্ত, রাজু আহমদ, সুমিতা দেবী, নারায়ণ ঘোষ, কল্যাণ মিত্র, আশরাফুল আলম, মামুনুর রশিদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরও অনেকে ছিলেন এতদিন পরে যাদের কথা মনে পড়ছে না। সংবাদ পাঠক হিসাবে হাসান ইমাম, কামাল লোহানী, পারভিন হোসেন, আলি যাকের, জাহেদ সিদ্দিকি প্রমুখ বিশেষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছিলেন।

তথ্য বিভাগ যদিও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেবের অধিকার-ভুক্ত ছিল তথাপি সার্বিক পরিচালনার ভার ছিল আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নান সাহেবের উপরে। ইনি প্রতিদিন বালু-হাক্কাক লেনে জয়বাংলা অফিসে নিয়মিত অফিস করতেন। এই বিভাগের সুচারু পরিচালনায় এঁর অবদান ছিল যথেষ্ট।

পার্টিতে মতবিরোধ

কোলকাতা পৌঁছার প্রথম দু'তিন মাস অর্থাৎ জুলাই পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কতটুকু জয়যুক্ত হতে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম না। যদিও আমার কোলকাতা পৌঁছার কয়েকদিন পরেই জানতে পারলাম পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের পক্ষে ডিফেক্ট করেছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ইউরোপ ও আমেরিকায় আমাদের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির চেষ্টায় প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন তথাপি ভারত সরকার আমাদিগকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না বলে হতাশা বোধ করছিলাম। এর মধ্যে আমার পরিচিত নিজ ও অন্যান্য জেলার কয়েকজন এম,পি,এ এম, এন, এ যখন একা আমার সঙ্গে আলাপ করতো তখন মনে

www.pathagar.com

হতো এরা ভিতরে ভিতরে প্রায় ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে। অনেকেই তাদের পরিবার সঙ্গে আনতে পারেনি। তাদের মধ্যে অনেকেই পরিবারের খবরাখবর তখন পর্যন্ত জানতে পারেনি। তাই প্রত্যেকেই ছিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ঐসময় অনেকেরই মনোভাব ছিল ভারত আমাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানীদের পরাজিত করে আমাদের সরকারকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছে না কেন? কিন্তু এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা যে কি বিরাট এবং জটিলতা যে কত সূক্ষ্ম এটা বুঝবার মত জ্ঞান আমাদের তখন হয়নি, যেহেতু অনেক তথ্যই আমাদের তখন জানা ছিল না। এ ছাড়া যখন জানতে পারলাম বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে পার্টিগত কোন্দল রয়েছে. তাজউদ্দিন সাহেবকে অনেকে সহ্য করতে পারছেন না, তাঁকে সরিয়ে অনেকে নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে চাচ্ছেন তখন মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

উপদলীয় কোন্দল ছাড়াও জানতে পারলাম বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম,এ,জি, ওসমানী যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে অনেক বিষয়ে একমত হতে পারছিলেন না বলে সামরিক কমান্ডের মিটিংয়ে মাঝে মাঝে অচল অবস্থা দেখা দিচ্ছিল। ওসমানী সাহেব ছিলেন বেশ বয়স্ক ব্যক্তি। যুদ্ধের কলাকৌশলের ব্যাপারে পুরানো ও গতানুগতিক চিন্তাধারার মানুষ তিনি। খালেদ মোশারফ, মেজর জিয়া ও অন্যান্য মেজর, সেক্টর কমান্ডাররা নতুন ও আধুনিক যুদ্ধকৌশলের ভাবধারায় অভ্যস্ত ছিলেন। নতুন ও পুরাতনের চিন্তার এ পার্থক্য যুদ্ধপ্রস্তুতিকে মাঝে মাঝে ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত করছিল। প্রথম প্রথম ওসমানী সাহেবের ঝোঁক ছিল প্রথাগত যুদ্ধের দিকে-"Conventional War". তাঁর ইচ্ছা ছিল ভারতের সাহায্যে আমাদের বেশ কয়েক ব্যাটেলিয়ন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা। এতে বেশ কিছু সময় লাগে তো লাগুক। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমাদের নিয়মিত সৈন্যদের দিয়ে সীমান্তের কোন কোন অঞ্চলে বেশ কিছু মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করা এবং পরবর্তীকালে সেই এলাকাগুলিকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করা। কিন্তু বাস্তব

www.pathagar.com

চিন্তার দিক থেকে ঐ এলাকাগুলোকে রক্ষা করার জন্য বিমান, গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া বাহিনী কোত্থেকে আসবে এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তরুণ সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে দু'চারজন ভিয়েতনাম ও অন্যান্য অঞ্চলে গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই নিয়মিত বাহিনীর চেয়ে গেরিলা যুদ্ধ ও তদসংক্রান্ত পরিকল্পনার উপরই বেশী জোর দিচ্ছিলেন। ফলে ওসমানী সাহেবের সঙ্গে সেক্টর কমান্ডারদের প্রায়ই মতবিরোধ ঘটায় দু'একবার তিনি প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন যেটা শেষ পর্যন্ত তাজউদ্দিন সাহেবের হস্তক্ষেপে প্রত্যাহৃত হয়।

বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর যেসব সৈন্য ও অফিসাররা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন সময় ভারত সীমান্তে এসে মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলছিলেন তাদের সঙ্গেও যুদ্ধ-প্রস্তুতির পরিকল্পনা নিয়ে অনেক সময় ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডারদের সঙ্গে মতবিরোধ হচ্ছিল। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ট্রেনিং, পরিকল্পনা ও মনস্তাত্ত্বিকতার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা পার্থক্য ছিল। ভারতীয় অফিসারদের তত্ত্বাবধানে ও ভারতীয় অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের জোয়ান ও অফিসার নিয়ে নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে গিয়ে মাঝে মাঝে কিছু জটিল সমস্যা দেখা দিত, যাতে বাস্তব ও কৌশলগত দিকের চাইতে মনস্তাত্ত্বিক দিকটিই ছিল প্রবল। স্বভাবগতভাবেই এম,এ,জি, ওসমানী একজন অতিমাত্রায় প্রখর আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের একটি শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য যে সময় ও প্রস্তুতি দরকার এবং সে প্রস্তুতিতে ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর তুলনামূলক ভূমিকা কি হবে এসব অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময় মাঝে মাঝে মতবিরোধ দেখা দেওয়া কিছুটা স্বাভাবিক ছিল, যে বিরোধ তাজউদ্দিন সাহেবের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত নিরসন করা হতো।

প্রথমে বিভিন্ন মুক্তিবাহিনীকে সাময়িকভাবে সাহায্য করা, পরে বিদ্রোহীদের ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির জন্য তাদের নিয়মিত বাহিনী গড়ে

www.pathagar.com

তুলে অস্ত্রায়িত করা, সর্বশেষে পাকবাহিনীকে পরাজিত করে দেশ দখলের জন্য নিয়মিত বাহিনীগুলোকে উপযুক্ত সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় বাহিনী নিয়োগের পরিকল্পনা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। বিদেশী হস্তক্ষেপ ও নিজ দেশে বিরোধী দলগুলোর কঠোর সমালোচনার ঝুঁকি নিয়েই ভারত সরকারকে একাজ সমাধা করতে হয়েছিল। আমরা সাধারণ সদস্যেরা এসব জটিলতা ও ভারত সরকারের সাহায্যের গুরুত্ব না বুঝলেও প্রবাসী সরকারের সিনিয়র সদস্যরা ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তবে সামরিক ক্রিয়াকলাপের সম্পর্কে যেসব মতভেদ ও অনৈক্যের কথা মাঝে মাঝে কানে আসতো তাতে খানিকটা নৈরাশ্য বোধ না করে পারছিলাম না।

আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে তাজউদ্দিন ছিলেন বোধ হয় সবচাইতে জ্ঞানী, লেখাপড়া জানা লোক ও বাস্তববাদী মানুষ। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞান পার্টিতে আর বোধ হয় কারো ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও অত্যন্ত স্পষ্টবাদী মানুষ যেটা আধুনিককালে রাজনীতিতে সাফল্যের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী। কারও মন রেখে কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। শুধু শেখ সাহেবের সমর্থনের জোরেই তিনি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারীর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী ও ফাইল ওয়ার্ক খুব ভাল জানতেন। এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও নীতিবান। ২৫শে মার্চের রাত্রিতে হত্যাকান্ড ও কারফিউ জারির পর ২৮ তারিখ ভোরে কারফিউ শিথিলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কুষ্টিয়ার ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামসহ জিনজিরা পার হয়ে ফরিদপুর, যশোহর হয়ে ভারত সীমান্তের দিকে রওয়ানা হন। ২৬ ও ২৭শে মার্চ এই দুই দিন লালমাটিয়াতে তিনি গফুর ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে তাজউদ্দিন সাহেব ও আমিরুল ইসলামই বোধ হয় সর্বাগ্রে কোলকাতায় পৌঁছে ভারত সরকারের

www.pathagar.com

সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ভারতে পৌঁছে বি,এস,এফ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাজউদ্দিন সাহেব বুঝতে পারলেন সীমান্ত অতিক্রমকারী আওয়ামী লীগ যুবকর্মী যারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে ভারত সরকারের সামরিক সাহায্যপ্রার্থী তাদেরকে কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড ও সামান্য কিছু হাল্কা অস্ত্রশস্ত্রের বেশী কিছু দিতে তারা নারাজ। তাজউদ্দিন সাহেব বুঝতে পারলেন বৃহত্তর সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। এসময় ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বরাবরই তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তাজউদ্দিন সাহেব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য যে পরিমাণ সামরিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের সাহায্য চাইলে ভাল হবে নাকি কোন সংগঠিত সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য চাইলে সে সাহায্য পাওয়া অধিকতর সহজ হবে এ প্রশ্ন খুব সম্ভব সে সময়ে তাজউদ্দিন সাহেবের মনকে দোলা দিচ্ছিল। ২৫শে মার্চ রাত্রে তাঁরা যখন শেখ সাহেবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন তখন পর্যন্ত স্বাধীনতা ঘোষণাও করা হয়নি এবং কোন সরকারও গঠন করা হয়নি। তথাপি একটি গঠিত সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাই তিনি সমীচীন মনে করলেন। তাই ইন্দিরা গান্ধীকে আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের নাম সহকারে একটি সরকারের রূপরেখা দিয়ে নিজেকে সে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করলেন। অবশ্য নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার পরে কোলকাতা ফিরে এসে তাঁর সহকর্মীদের কাছে তিনি দারুণভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন এবং এ সমালোচনা যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

মার্চের প্রথম থেকে ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। পূর্ব সীমান্তে এত জনবহুল একটি এলাকার বিদ্রোহী জনগণকে আয়ত্তে রাখতে গিয়ে পাকিস্তান

www.pathagar.com

সরকার হিমশিম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ুক এটা ভারত সরকারের কাম্য ছিল। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা বিরাট অংশ ব্যস্ত থাকলে সামরিক দিক থেকে ভবিষ্যতে ভারতের জন্য সুবিধা হবে বলে ইন্দিরা সরকার মনে করতো। তাই এ বিদ্রোহ সহসা প্রশমিত হোক এটা তারা চাচ্ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ যে আকার ধারণ করেছিল তাতে শেষ পর্যন্ত এ ভূখণ্ড যদি স্বাধীন হয়ে যেতে পারে তাতে ভারতের বিরাট লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। পূর্বাঞ্চলে তাদের যে কয়েক ডিভিশন সৈন্য রাখতে হতো সেটা রাখতে হবে না। তাই ভারত সরকার তাজউদ্দিনের উপস্থাপিত সরকারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল। অবশ্য এ সিদ্ধান্তের পিছনে শুধু সামরিক বিবেচনাই কাজ করেছিল এমন নয়। মানবিক চিন্তা ও সহানুভূতি এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে অনেকখানি কাজ করেছিল বলা চলে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ভারতীয় জনসাধারণ ও সরকার অনেকটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতো। নির্যাতিত পূর্ব বাংলার লোকদের পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হাত থেকে তাদের ন্যায্য অধিকারের লড়াইকে ভারতীয় জনসাধারণ বেশ কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখছিল। তাই পঁচিশে মার্চের হত্যাকান্ড আরম্ভ হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষ, যার মধ্যে অধিকাংশ ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক, তাঁরা যখন পাক-জান্তার নির্মম শিকার হতে আরম্ভ হলো তখন তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসার একটা মানবিক তাগিদও ইন্দিরা সরকার নিশ্চয় অনুভব করেছিল। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন যে, ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পর তাদের সাহায্যে প্লেন নিয়ে বিভিন্ন বর্ডার শহরগুলি থেকে খোন্দকার মোস্তাকসহ অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতাকে তুলে তিনি কোলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সরকার গঠনের কিছুদিন পরেই পার্টিতে উপদলীয় কোন্দল শুরু হলো যেটা তাজউদ্দিন সাহেব পূর্বেও কোনদিন পছন্দ করতেন না এবং যার কলাকৌশলও তাঁর জানা ছিল না।

www.pathagar.com

এরমধ্যে আর এক অসুবিধা দেখা দিলো। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের জন্য নিজের পার্টির ভিতর থেকে চাপ আসতে লাগল। তাজউদ্দিন সাহেব রাজি হলেন না। তিনি ভেবে দেখলেন একবার যদি মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ আরম্ভ হয় তবে সেটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে তার ঠিক নেই। সবাই তখন মন্ত্রিত্বই করবে, আনন্দ করবে, যুদ্ধের কাজ কিছু হবে না। এ ছাড়া ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিও মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো। মুক্তিযুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দলের অকুণ্ঠ সমর্থন একান্ত প্রয়োজন একথা ভেবে তাজউদ্দিন সাহেব তাদের দুই-একজন প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় নিতে বোধ হয় রাজী ছিলেন কিন্তু আওয়ামী লীগের ডানপন্থী নেতাদের সক্রিয় বিরোধিতার কারণে তাঁর পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয়নি। আর পার্টিতে এই ডানপন্থী নেতারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অত্যন্ত শক্তিশালী।

পার্টিতে উপদলীয় কোন্দল, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ার ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রচেষ্টা বেশ খানিকটা ব্যাহত হতে লাগল। আওয়ামী লীগের নেতারা চাচ্ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বাছাইয়ের ব্যাপারে তাঁরা যেন বিশেষ কোন সুযোগ না পায়, যত কম সংখ্যক লোক যেন ট্রেনিং পায় আর বামপন্থী দলগুলো চাচ্ছিলো তাদের দলের লোকদের যত অধিক সংখ্যায় ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করে দিতে। এই প্রচেষ্টায় সবারই লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের দিকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক যার দলে যত বেশী থাকবে তারই তত সুবিধা। তাজউদ্দিন সাহেব পুরামাত্রায় বামপন্থী মতবাদের লোক ছিলেন বলে ন্যাপ বা কমিউনিস্ট পার্টি এমনকি চীনপন্থী অল্পসংখ্যক লোকও যদি ট্রেনিং পায় তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না। তিনি মনে করতেন দেশ স্বাধীন হওয়া নিয়ে কথা। সবাই যখন বাঙ্গালী, রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্থক্য থাকলেও সবাইর মধ্যে দেশপ্রেম যখন রয়েছে তখন দেশসেবার ব্যাপারে সবাই শেষ পর্যন্ত একমত হবেই। তাই সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রথম কয়মাস আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আপত্তির ফলে বামপন্থী যুবকেরা ট্রেনিং ক্যাম্পে ঢোকার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত সহযোগিতা পাওয়ার প্রয়োজন যখন গভীরভাবে অনুভূত হলো তখন সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বেশ কিছু সুবিধা দিতে আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন। এর ফলে আগস্ট, সেপ্টেম্বর থেকে বামপন্থী যুবকদের ট্রেনিংয়ের সুযোগের পথ অনেকটা প্রশস্ত হলো।

তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা

'৭১-এর ঐ নয় মাস যে কত প্রতিবন্ধকতা ও মানসিক অশান্তির মধ্য দিয়ে তাজউদ্দিন সাহেবকে সার্বিক মুক্তি প্রচেষ্টা সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল তা ভাবলে অবাক লাগে। তাঁর মানসিক ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসকে সত্যিই প্রশংসা করতে হয়। দলের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল ছাড়াও আরও একটি শক্তি তাঁকে প্রতি মুহূর্তে আঘাতের দ্বারা দুর্বল করে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সেটা **হলো শেখ ফজলুল** হক মনির নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতাদের আক্রমণ। তারা এপ্রিলের প্রথম দিকে কোলকাতায় পৌঁছেই ভারত সরকারকে জানালো যে তারাই শেখ সাহেবের সত্যিকারের প্রতিনিধি, তাজউদ্দিন নয়। তারা মিসেস গান্ধীকে বললো যে শেখ সাহেব ২৫শে মার্চ রাতে দেশ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাজউদ্দিনের তাঁকে নিয়ে আসবার কথা ছিল এবং সুটকেসে কাপড়-চোপড় ভরে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন কিন্তু তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হবার লোভে শেখ সাহেবকে পরিত্যাগ করে একা ভারতে চলে এসেছে। তাই সে একজন প্রতারক। এবং তারাই শেখ সাহেবের সত্যিকারের প্রতিনিধি, তাজউদ্দিন নয়। অতএব প্রবাসী সরকার গঠনের তারাই একমাত্র বৈধ অধিকারী।

এসব বানোয়াট কাহিনী বলে মিসেস গান্ধীর বিশ্বাস উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে তারা যখন তাজউদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলো না

www.pathagar.com

তখন তারা তাজউদ্দিন বিরোধী গ্রুপসমূহের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসব কল্প-কাহিনী প্রচার দ্বারা এম, পি, এ এম, এন, এ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রভাবিত করে তাজউদ্দিন সাহেবকে অপসারিত করার চেষ্টা চালাতে লাগলো। তাদের এ প্রচেষ্টা অক্টোবর, নভেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। মিসেস গান্ধী ও তাঁর পরামর্শদাতারা অনেক বেশী বুদ্ধিমান। শেখ মনির দলের ছোকরাদের কথায় আস্থা স্থাপনের মতো নির্বোধ মিসেস গান্ধী ছিলেন না। তাই তিনি তাজউদ্দিনকে বরাবর পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যেতে লাগলেন। এবং তাঁর সমর্থনের বলেই পার্টিতে তাজউদ্দিনবিরোধী লবী খুব শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ থেকে সরাতে পারেনি।

আওয়ামী লীগের ডানপন্থীদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধাচরণ করলেও বামপন্থী দলগুলোর তিনি পুরোপুরি সহযোগিতা পাচ্ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকে সুচারুরূপে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে ভাল বোঝাপড়া হোক মনেপ্রাণে ভারত সরকারও এটা চাচ্ছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁরা খানিকটা চাপও প্রয়োগ করে যাচ্ছিল। এদিকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ প্রচেষ্টায় ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে একটা সম্মানজনক স্থান না দিলে মুক্তিযুদ্ধ যে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের একতাবদ্ধ সংগ্রাম এটা প্রমাণ করা যাচ্ছিল না; রাশিয়ার সক্রিয় সাহায্যের জন্য এই মুহূর্তে যেটার একান্ত প্রয়োজন ছিল। মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার জন্য বিরোধী দলগুলির একান্ত চাপের মুখে তাজউদ্দিন সাহেব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যখন খুব বিব্রত বোধ করছিলেন তখন সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে এলেন দেরাদুন থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ধুবড়ি হয়ে আসামের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঈনুল হক চৌধুরীর সহায়তায় কোলকাতায় আসেন। ভারত সরকার যথাযথ মর্যাদার সাথে এই প্রবীণ রাজনীতিবিদকে পার্ক স্ট্রীটের কোহীনুর ম্যানশনের একটি ফ্ল্যাটে থাকার আয়োজন করে দেন। মওলানা ভাসানী দেশ বিভাগের পূর্বে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি থাকার সময় এই মঈনুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ছিলেন।

www.pathagar.com

'৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। নিজে চীনপন্থী কিন্তু চীন তখন পাকিস্তানকে সমর্থন করা সত্ত্বেও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দেশে তাঁর প্রাণসংশয় হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর দলের লোকেরা তাঁকে চীনে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু চীনে গেলে তাঁকে পাকিস্তানকে সমর্থন দিতে হবে এই ভয়ে তিনি চীনে যেতে রাজী না হয়ে পাকিস্তানী হানাদারদের হাত এড়ানোর জন্য আসামে চলে যান। তাঁর বিশ্বাস ছিল বরাবর তিনি ভারত সরকারের নীতির কঠোর সমালোচক হলেও বর্তমান মুহূর্তে ভারত যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সাহায্য করতে ইচ্ছুক তখন ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাঁর ক্ষতি হবে না। বরং ভারতে থেকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বেশী অবদান রাখতে পারবেন। পূর্বাপর অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তাঁর এ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ সংকটের সময় প্রবাসী সরকারকে তিনি মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে নানাভাবে উপকৃত করেছিলেন। বিরোধী দলগুলি এটা জাতীয় সংগ্রাম, তাই জাতীয় সরকারে সব দলের প্রতিনিধি থাকতে হবে বলে যখন দারুণ পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করে তখন মওলানা সাহেব হস্তক্ষেপ করেন। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আওয়ামী লীগকে যেহেতু '৭০-এর নির্বাচনে বাংলার মানুষ শতকরা সাতানব্বই ভাগ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে তখন সরকার চালাবার অধিকার তাদেরই রয়েছে। এখন ভারতের বুকে বসে অন্যান্য দলকে নিয়ে সরকার গঠন করলে পাকিস্তান সরকার প্রচার করবার সুযোগ পাবে যে '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ের পেছনে ভারতের প্রভাব, কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র ও সাহায্য অনেকখানি কাজ করেছিল। তাই মন্ত্রিসভায় নির্বাচনে পরাজিত অন্যদলের অন্তর্ভুক্তি অনুচিত হবে। যুদ্ধ পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের সুবিধার্থে তিনি একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেন। মওলানা ভাসানী এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পূর্বে মওলানা ভাসানী কিছু দিন কোলকাতায় থেকে পরে কুচবিহার, দেরাদুন, রানীক্ষেত প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন সময় বাস করেন। বাংলাদেশের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও পরিচালনার কেন্দ্রস্থল ছিল কোলকাতা। এ স্থান ত্যাগ করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অতদূরে কেন চলে গিয়েছিলেন অনেকের মনে তখন এ ব্যাপারে প্রশ্ন জেগেছিল। তবে কি তাঁর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ভারত সরকার একমত হতে পারছিলেন না বলে তাঁকে অতদূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি কোন প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন? তা হলে কি তাঁকে প্রকারান্তরে ভারতে বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিল? এরূপ প্রশ্ন পরবর্তীকালে অনেকের মনে দেখা দিয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা ভারতবিরোধী প্রচারণায় এরূপ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমার মনে হয় কোলকাতা পৌঁছার অল্প সময়ের মধ্যে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের নেতাদের উপদলীয় কোন্দলের ব্যাপারটা ভালভাবেই টের পেয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন গ্রুপ কোহীনুর ম্যানশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতো এবং তাদের সঙ্গে আলাপে ভিতরকার কোন্দল এবং তাজউদ্দিনের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ও অনাস্থার মনোভাব তিনি বুঝতে পারতেন। তাজউদ্দিনকে তিনি খুব স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন এবং স্বাধীন বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, সংগ্রামী মনোভাব ও মুক্তিসংগ্রামের পরিচালনায় সকল দলের সহযোগিতা গ্রহণের উদার মনোভাবের তিনি প্রশংসা করতেন।

খোন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে ডানপন্থী আওয়ামী লীগ নেতাদের মুজিব বাহিনীর কর্তাদের সহযোগিতায় তাজউদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা তাঁকে খুব মর্মাহত করে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এরা যে পথে চলেছে তাতে এরা নিজেরাও ধ্বংস হবে, মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত প্রচেষ্টাকেও ধ্বংস করবে, পরিণতিতে তিব্বতের শরণার্থীর মত এদের অবস্থা হবে। শুধু আওয়ামী লীগ নেতাদের বামপন্থী যুবকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে আপত্তি নয়, বামপন্থী বিভিন্ন দলের নিজেদের মতের অনৈক্যও তাঁকে পীড়িত করে। যুদ্ধকালে

www.pathagar.com

একটা গুরুতর অনিশ্চিত অবস্থায় স্বদেশের মুক্তির জন্য যে ইস্পাতকঠিন ঐক্য, দায়িত্ববোধের প্রতিফলন, আচার-আচরণ সকল কর্মী ও নেতার কাছে তিনি আশা করেছিলেন তা না দেখতে পেয়ে কোলকাতা থেকে বহুদূরে তিনি চলে যেতে চেয়েছিলেন যেখানে তাঁর মানসিক যন্ত্রণা কম হবে। তাঁর নিজের দলের কর্মী মেনন, রনো, জাফরকে আওয়ামী লীগ নেতারা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেননি। তাদেরকে চীনপন্থী বলে সন্দেহ করতেন। তারা বিভিন্ন সেক্টরে নিজেদের চেষ্টায় সেক্টর কমান্ডারদের সহায়তায় নিজেদের পার্টির কিছু কিছু যুবকের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল। অবস্থাদৃষ্টে প্রস্তাবিত উপদেষ্টা কমিটিতে তিনি তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন না মনে করে কোলকাতার বাইরে চলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

তিনি যখন যেখানে যেতে চেয়েছিলেন তাঁকে তখনই সেখানে যেতে দেওয়া হয়েছিল ঠিক একথাও বলা চলে না। তিনি কোথায় কোথায় যেতে চান তার তালিকা পূর্বে জানালে ভারত সরকার কখন কোথায় যাবেন সেটা ঠিক করে দিতেন। হয়তো যেখানে যেতে চান সেখানে নিরাপত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ভারত সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হতো বলে গন্তব্যস্থান আগে-পরে নির্ধারিত হতো। এ সময় তাঁর দলের সেক্রেটারী জেনারেল মশিউর রহমান যাদু মিয়া কিছুদিন ভারতে থেকে আবার বাংলাদেশে চলে আসায় আমরা সবাই যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম তেমনি ভারত সরকারও কিছুটা সাবধান হয়ে গিয়েছিল। অনেকের ধারণা, পাকিস্তান সরকারের পরামর্শে মশিউর রহমান ভারতে এসে মওলানা ভাসানীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে চীনে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল। এ পরিস্থিতিতে চীনপন্থী মওলানা ভাসানীর ব্যাপারে ভারত সরকার যদি একটু বেশীমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে তবে তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না।

আর একজন আওয়ামী লীগ নেতা যিনি নেপথ্যে থেকে মন্ত্রিসভার সকল বৈঠককে সফল করা এবং বিভিন্ন উপদলের সঙ্গে

www.pathagar.com

সমন্বয় সাধন করার কাজে ব্রতী ছিলেন তিনি হলেন সিলেটের জাতীয় সংসদ সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ। ইনি একসময়ে ভাসানী ন্যাপের বিশিষ্ট সদস্য ও মওলানা ভাসানীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সরকার পরিচালনার ব্যাপারে এঁর কাছেই তাজউদ্দিন সাহেব সম্ভবত সবচাইতে বেশী সাহায্য পেয়েছিলেন।

মে মাসের মাঝামাঝি আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের কিছু প্রতিনিধি হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচারকার্য চালানোর জন্য গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে প্রচারকার্য চালিয়ে দিল্লীতে পৌঁছার পর ন্যাপের বিশিষ্ট নেতা দেওয়ান মাহবুব আলী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৪ঠা জুন মৃত্যুবরণ করেন। দিল্লীতেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। আমার জীবনে এত নিষ্ঠাবান সৎ ও খাঁটি দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ খুব কম দেখেছি। ইনি ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে জেলে থাকা অবস্থায় প্রায় চব্বিশ হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা কি পরিমাণ ছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি আমার আত্মীয় ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। '৫৮ সনে আইউব খানের মার্শাল–ল জারীর কয়েক দিন পরে গ্রেফতার এড়াবার জন্য আমার বাসায় আত্মগোপন করে প্রায় একমাস কাটিয়েছিলেন। একটি জরুরী কাজে কয়েকদিনের জন্য কোলকাতায় গিয়ে ফিরে এসে শুনলাম আমার চলে যাওয়ার পর তিনি অন্য বাসায় গিয়ে সেখানে গ্রেফতার হয়েছেন। আমার বাসায় গ্রেফতার না হয়ে অন্য বাসায় গ্রেফতার হওয়াতে মানসিক দিক থেকে নিজেকে অপরাধমুক্ত মনে করলাম। তাঁর মৃত্যুর খবর কোলকাতা পৌঁছার পর দলমত নির্বিশেষে সকল নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। দেওয়ান সাহেবের পরিবার ঢাকাতেই রয়ে গিয়েছিল, সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ পায়নি। তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সেদিন গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন ও শেখ মনির দ্বন্দ্ব

তাজউদ্দিন সাহেব সারাদিনই প্রায় বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে তিনি আউটরাম ঘাটের দিকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতেন। দুই-একদিন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ড ও গোয়েন্দা বিভাগের লোক থাকলেও তারা দূরে থাকতো বলে আমাদের কথা বলতে অসুবিধা হতো না। এরমধ্যে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নুরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে দেরাদুনে মুজিব বাহিনীর নামে বাংলাদেশ সরকারের অগোচরে অন্য একটি বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছিল। এই বাহিনীতে পাঁচ হাজার যুবককে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছিল। ব্যাপারটা তাজউদ্দিন সাহেবকে ভীষণভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি একদিন আমাকে বললেন, মোহাইমেন সাহেব, আমার জীবন খুব সম্ভবত সূক্ষ্ম সুতার একপ্রান্তে ঝুলছে। আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, শেখ মনি তারা এখানে বলে বেড়াচ্ছে যে আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভে শেখ মুজিব যিনি ২৫শে মার্চ রাত্রে আমার সঙ্গে গৃহত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁকে ফেলে চলে এসেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজিব ভাই ফিরে এসে যদি ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করেন তবে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সংগে সংগে আমাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরূপ ঘটনা ঘটার কি কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন? তাজউদ্দিন সাহেব বললেন, তিনি হয়তো স্বেচ্ছায় এটা বলবেন না তবে তাঁর ভাগিনা এবং পরিবারের লোকদের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। তাদের চাপে এবং রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে তিনি যে বলবেন না এ কথাও জোর করে বলা যায় না। এছাড়া মুজিবনগরে আমার সহকর্মী নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দের অনেকেই আমাকে পছন্দ করে না। বর্তমানে বাধ্য হয়ে আমার নেতৃত্ব মেনে চলছে। স্বাধীনতাউত্তরকালে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিতে যদি এ ষড়যন্ত্রে তাঁরাও যোগ দেয় তবে বিস্মিত হবো না। তাই আমার জীবন সুতার আগায় ঝুলছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি তখন বললাম, তা হলে আপনি কি চান না যে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসুক? তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বললেন, নিশ্চয়ই চাই কারণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেবে তার মোকাবেলা করে স্থিতিশীলতা আনা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি ফিরে না এলে আমার সহকর্মী ও দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধতার মুখে আমি কিছুই করতে পারব না। তাদের পূর্ণ সহযোগিতা পেলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসব গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা হয়তো কিছুটা করতে পারব কিন্তু তাদের বিরোধিতায় কিছুই করা সম্ভব হবে না। তাই দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁর ফিরে আসা একান্ত প্রয়োজন, তাতে আমার ব্যক্তিগত বিপদের সম্ভাবনা যতই থাকুক না কেন। আমি বললাম, যদি শেখ সাহেব দেশে ফিরে এসে সত্যি কথা বলেন এবং আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়ে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দেন তবে দেশ চালাতে পারবেন? তিনি বললেন, খুব পারব, তবে সেটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর '৭২-এর ১০ই জানুয়ারী যেদিন বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন সেদিন আমি লক্ষ্মীপুরের নিজের এলাকায় ছিলাম। ১১ তারিখ বিকেলে ফিরে আমি যখন তাঁর বাসায় গেলাম তিনি আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বললেন, মোহাইমেন সাহেব, I have got a fresh lease of life. আমি এবারের জন্য বেঁচে গেলাম। বঙ্গবন্ধু গতকাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় বলে ফেলেছেন-- ২৫শে মার্চ রাত্রে হানাদার বাহিনী রাস্তায় নেমে আসার পর তিনি আমাদের সবাইকে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ করতে বলেছিলেন এবং পাক সেনাদের হত্যাকাণ্ডকে নিম্নতম পর্যায়ে রাখার

www.pathagar.com

জন্য তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন। একথা জনসমক্ষে বলার পর আর অন্য কথা পরে বলা সম্ভব নয় বলে আমি বেঁচে গেলাম। তাজউদ্দিন সাহেবের মুখে পরে শুনেছি ১০ তারিখে বিমানবন্দর থেকে তাঁকে সোজা জনসভায় না এনে ৩২ নম্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শেখ মনি তারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে তিনি খুব ক্লান্ত, এই অজুহাত দেখিয়ে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন জনসভায় আসার জন্য তারা ঐকান্তিক অনুরোধ জানিয়েছিল কিন্তু শেখ সাহেব অগণিত মানুষ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁর অপেক্ষা করছেন শুনে কোন অনুরোধ-উপরোধেই কান না দিয়ে সোজা জনসভায় চলে আসেন এবং সত্য কথা বলে ফেলেন। তাই শেখ মনিদের কোন ষড়যন্ত্রই খাটেনি। তাজউদ্দিন সাহেবের ধারণা, সেদিন যদি তাঁরা শেখ সাহেবকে ৩২ নম্বরে নিয়ে যেতে পারতো তবে সারা রাত তাঁর মস্তিষ্ক ধোলাই করে পরদিন তাঁকে দিয়ে হয়তো অন্য রকম বলাতেও পারতো এবং তার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। সে অবস্থায় জনতার রুদ্ররোষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই তার জীবনের ইতি হয়ে যেত।

যাই হোক, যে কথা প্রথমে বলছিলাম, শেখ সাহেব ফিরে এসে উল্টো কথা বললে তার জীবন সংশয় হবে একথা জেনেও তাজউদ্দিন সাহেব দেশের স্বার্থে যেভাবে শেখ সাহেবের মুক্তি ও প্রত্যাগমন কামনা করেছিলেন সেটা দেখে লোকটির দেশপ্রেম, স্বদিচ্ছা ও হৃদয়ের প্রসারতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাজউদ্দিন সাহেবের সহকর্মীরা যে সবসময় তাঁর বিরোধিতা করতো এমন নয়। তবে প্রশাসন পরিচালনায় লোক নিযুক্তি, বৈদেশিক নীতি, মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী দলসমূহের অংশগ্রহণের ব্যাপারে মাঝে মাঝে মতবিরোধ দেখা দিত এবং মতবিরোধের প্রধান কারণ ছিল উপদলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার নিরীক্ষা এবং তাজউদ্দিনের প্রতি প্রথম থেকে বিরূপ মনোভাব পোষণ। নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই বিশেষ করে খোন্দকার মোস্তাক নিজেকে তাজউদ্দিনের সমকক্ষ বা তাঁর চাইতে যোগ্যতর মনে করত। তাই তারই প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল ভাবত। তাই বিভিন্ন উপদলকে উত্তেজিত করে মুজিব বাহিনীর

www.pathagar.com

নেতাদের সাহায্য নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে সরাবার চেষ্টায় ছিল। উপদলীয় নেতারা সংসদ সদস্য, সাধারণ কর্মী, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতো যে তাজউদ্দিন নেতৃত্বে থাকলে ভারত স্বীকৃতি দেবে না; অন্যান্য রাষ্ট্রও স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করছে এটাও তাজউদ্দিনের কারণে। তাজউদ্দিন আওয়ামী লীগের নীতি ও স্বার্থবিরোধী কাজ করে বামপন্থীদের সুযোগ সুবিধা বেশী দিচ্ছে। তাই তার অপসারণ মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ও আমাদের দেশে প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

ভারত যে আমাদের চট করে স্বীকৃতি দিতে পারে না, এর সঙ্গে বহু জটিল আন্তর্জাতিক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষেও একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি অংশকে হঠাৎ করে স্বাধীন বলে স্বীকার করা যে কত কঠিন এবং কতটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এটা সাধারণ সদস্য ও কর্মীরা অনেকেই বুঝতে পারছিল না বলে প্রচারণাকারীদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে তাজউদ্দিনের উপর বিরক্ত হয়ে উঠছিল। আমার সঙ্গে অনেকেরই তর্ক হতো। একদিন আমি যখন বললাম, ধরুন আমাদের চাপে ভারত আমাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কাল স্বীকৃতি দিয়ে দিল; অন্য কেউ স্বীকৃতি দিল না। দু'দিন পরে যদি পাকিস্তান সরকার শেখ সাহেবকে মুক্তি দিয়ে দেয় এবং তিনি যদি মুক্ত হয়ে আমাদের সবাইকে ডাক দিয়ে বলেন-- ছয় দফা পেয়ে গেছি, পাক সরকার আমাদের সব দাবী মেনে নিয়েছে, তোমরা সব ঢাকায় চলে এসো--তখন কি হবে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থাটা কি অত্যন্ত করুণ ও লজ্জাজনক হয়ে দাঁড়াবে না? এ কথায় বন্ধুরা লা-জওয়াব হয়ে গেল। ভারতে বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী মুনসুর আলী সাহেবই বোধ হয় তাজউদ্দিন সাহেবকে সবচাইতে বেশী সহযোগিতা দিতেন। এই মুনসুর আলী সাহেবকে আমি দেখেছি অতি সজ্জন, অমায়িক ও সাদা দিলের মানুষ। স্বাধীনতার পর তিনি শেষদিকে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হন তখনো তাঁকে দেখেছি সৎ, নিরহঙ্কার, অমায়িক ও একজন ভদ্রমানুষ হিসাবে।

www.pathagar.com

মুজিব বাহিনীর নেতারা তাজউদ্দিন সাহেবকে ভারত সরকার, আওয়ামী লীগ কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সর্বদা হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতো। মাঝে মাঝে টাকা-পয়সা, যানবাহন ও বিভিন্ন ধরনের অন্যায় সুযোগ-সুবিধাই যে শুধু দাবী করতো তাই নয় অনেক সময় ভারতীয় অফিসারদের সামনে তাঁকে লাঞ্ছিত করতেও দ্বিধা করতো না। একদিনের কথা আমার মনে আছে। সন্ধ্যার পর আমি ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে গেলাম তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় তিনি দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপছেন। তার অনতিদূরে ছাত্রলীগের এক প্রভাবশালী নেতা দাঁড়িয়ে। ইনি বর্তমানে টাঙ্গাইলের জাসদের একজন বিশিষ্ট নেতা ও সংসদ সদস্য। তাজউদ্দিন সাহেব ক্রুদ্ধ স্বরে বলছেন আমি দিতে পারব না আর ছাত্রনেতাটি বলছে - আপনাকে দিতেই হবে - আপনি না দেওয়ার কে? আপনি তো একজন ইমপস্টার প্রতারক। তখন তাজউদ্দিন সাহেব রেগে বললেন, ইউ গেট আউট ফ্রম হিয়ার। ছাত্রনেতাটি প্রত্যুত্তরে বললো, হোয়াই শুড আই গেট আউট, ইউ বেটার গেট আউট। এসময় ভারতীয় প্রধান সিকিউরিটি অফিসার, নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যাপারে নিয়োজিত অফিসার, সিকিউরিটি গার্ড সব মিলিয়ে আট-দশ জন লোক অবাক বিস্ময়ে ঘটনা অবলোকন করছিল। একটা স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর দেশের একজন ছাত্রনেতা বলছে বেরিয়ে যাও! অকল্পনীয় ব্যাপার। এতগুলি বিদেশী লোকের সামনে নিজেদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অপদস্থ হতে দেখে লজ্জায় আমি মুখ তুলতে পারছিলাম না। আমি ভয় করছিলাম চার খলিফার এক খলিফা এই নেতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর হাতাহাতি না হয়ে যায়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ক্রোধ সংবরণ করে তাজউদ্দিন সাহেব নিজের কামরায় চলে গেলেন এবং ছাত্রনেতাটিও ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ পর তাঁর কামরায় গিয়ে ব্যাপার কি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এরা যখন তখন এসে বলবে টাকা দিন। আলাদা ফাণ্ড থেকে এদেরকে রীতিমত মাসোহারা দেওয়া হয় হাত-খরচ হিসাবে। এরা অধিকাংশই হোটেলে থাকে এবং হোটেলে

www.pathagar.com

থাকা-খাওয়ার খরচ বাংলাদেশ সরকার বহন করে। হাতখরচ হিসাবে যা দেওয়া হয় মাসের জন্য তা যথেষ্ট। তার উপর প্রায়ই আমার নিকট টাকা চেয়ে বসে এবং মাবে মাবে আমাকে কিছু দিতে হয়। এই ছেলেটিকে মাত্র কয়েকদিন আগে ১০০ টাকা দিয়েছি, আজ আবার এসে টাকা চাওয়ায় আমি দিতে অস্বীকার করায় কি ব্যবহার করলো নিজের চোখেই তো দেখলেন। বিদেশী এতোগুলি লোকের সামনে অপদস্থ হওয়ায় তাঁর মনে খুবই লেগেছিল। তিনি খুব ধীর-স্থির মানুষ, ভাবাবেগে সহজে বিচলিত হন না। কিন্তু আজ দেখলাম আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করছিলেন। তাঁর বোধ হয় অপমানে কান্না পাচ্ছিল। তিনি অনেক চেষ্টায় গলা পরিষ্কার করে আমাকে বললেন, এ ভার আমি আর বইতে পারছি না। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি শেখ সাহেব যতশীঘ্র হয় ফিরে আসুক। তাঁর হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই।

মুক্তিযুদ্ধ ও মারওয়ারী ব্যবসায়ী

ছাত্রলীগের এই নেতারা বেশীর ভাগ শিয়ালদহ ও হ্যারিসন রোড এলাকার টাওয়ার হোটেল, টাওয়ার লজ, ইন্ডিয়া হোটেল, প্রেসিডেন্সি হোটেল নামক বিভিন্ন হোটেলগুলিতে বাস করতো। সেখানে আরো কিছু কিছু আওয়ামী লীগ ও ন্যাপনেতারা থাকতো বলে আমি মাবে-মধ্যে এইসব হোটেলে যেতাম। গেলে দেখতাম প্রায় প্রতিটি ছাত্রনেতার পেছনেই দু'চারজন মারওয়ারী ব্যবসায়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের খুব ভাব দেখতাম। এরা এসব ছাত্রনেতাদের পেছনে বেশ টাকা খরচ করছে বুঝতে পারতাম। ফ্রন্ট থেকে আগত দু'চারজন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগেও এসব মারওয়ারী ব্যবসায়ীদের বেশ ঘনিষ্ঠতা দেখতাম। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগতো না। আমি জানতাম মারওয়ারীরা অত্যন্ত ধূর্ত। এরা বুঝেছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হবে। তাই এখন থেকে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে স্বাধীনতার পর ব্যবসার খুব সুবিধা

www.pathagar.com

হবে। এইজন্যই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে শেখ মনি থেকে আরম্ভ করে ছাত্রলীগের প্রথম কাতারের সব নেতার পেছনে এরা ঘুরে বেড়াতো এবং সর্বতোভাবে এদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতো। দেশ স্বাধীন হবার পর কোটি কোটি টাকার বিভিন্ন মিলের যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও মজুত মাল শত শত ট্রাক ভরে সীমান্তের অপর পারে এরা নিয়ে গিয়েছিল যার জন্য অযথা ভারতকে দায়ী করে স্বাধীনতার পরপরই ভারতের বিরুদ্ধে প্রচুর বিদ্বেষ ছড়াবার অবকাশ হয়েছিল। এই অপহরণ বা চোরাচালানের জন্য ভারতকে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না কিন্তু কাজটা যেহেতু করেছে ভারতীয় নাগরিক মারওয়ারীরা তাই অপহরণের সব দায়িত্বই ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এই অপকর্মের সহযোগী ছিল আমাদের দেশেরই কিছু কিছু তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রনেতা ও নীতিহীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দেখেছি যখন দেশে প্রচুর বস্ত্রসংকট দেখা গেল তখন টিসিবি'র মারফৎ ভারত থেকে কয়েক কোটি টাকার শাড়ী, লুঙ্গি প্রভৃতি আমদানী করতে গিয়েও আমাদের অফিসারদের লোভের ফলে যে ঘাপলা হলো তার দায়দায়িত্ব ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পরিধেয় বস্ত্রের বার আনাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সে সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় শাড়ী, লুঙ্গির অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিল। আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়েক কোটি টাকার কাপড় বাংলাদেশ সরকার টিসিবি'র মারফৎ আমদানীর সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য খুব উদগ্রীব তাই ব্যক্তিগত কোন ব্যবসায়ীকে কাপড় আমদানী করতে না দিয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা টিসিবি'র মারফৎ আমদানীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু টিসিবি'র আদর্শহীন ও অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রহীন অফিসারেরা কাপড় কিনতে গিয়ে মারওয়ারী ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে গেল। তখন কোটি কোটি টাকার শাড়ী, লুঙ্গি সরবরাহকারী মারওয়ারীরা টিসিবি'র অফিসারদের কে কত বেশী পরিমাণে কমিশন দেবে এই লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেললো।

www.pathagar.com

কমিশন যত বেশী হতে লাগলো কাপড়ের বহর তত খাটো এবং জমিন ততই হালকা, রং ততই কাঁচা হতে আরম্ভ হলো। ফলে দেশে যে কাপড় এসে পৌঁছালো তা দশ হাতের জায়গায় দেখা গেল আট হাত, গোড়ালী পর্যন্ত লম্বার পরিবর্তে উঠে এলো হাঁটু পর্যন্ত, ঘন জমিনের পরিবর্তে দেখা গেল মশারির কাপড়ের মতো পাতলা যা দিয়ে নারী-পুরুষের আব্রু ঢাকা কঠিন হয়ে পড়লো। এ কমিশন সম্পর্কিত বিপর্যয় যেটা ঘটলো টিসিবি'র অফিসার ও মারওয়ারী ব্যবসায়ীদের লোভের ফলে তার জন্যও অযথা ভারতকেই দায়ী করা হয়েছিল। যেহেতু কাপড় আসছিল ভারত থেকে তাই স্বাধীনতাবিরোধীরা নিজেদের দেশের অফিসারদের নিম্নমানের ও পরার অনুপযোগী কাপড় আমদানীর জন্য দায়ী না করে ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে পানি ঘোলা করতে আরম্ভ করলো। এ সময় বর্ডার প্যাক্টের সুযোগ নিয়ে শত শত কোটি টাকার ধান, চাল সীমান্তের অপর পারে চোরাচালান হয়ে গেল। আমাদের দেশের লোকই এগুলো মাথায় করে সীমান্ত পার করে দিয়ে এসেছিল, ইন্দিরা গান্ধী বা তাঁর নিয়োজিত লোকেরা এসে মাথায় করে নিয়ে যায়নি। কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় নিজের দেশের মানুষের দেশপ্রেমহীনতাকে দায়ী না করে ভারতের ঘাড়ে সে সময় সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দোষমুক্ত হওয়ার একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি। এর ফলে স্বাধীনতার পরপরই এমন একটা ভারতবিরোধী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যেটা আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতের সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল তার সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ব্যাপারটা যেকোন চিন্তাশীল লোককে সে সময় ব্যথিত করেছিল।

তাজউদ্দিন ও মুজিব বাহিনী

মুজিব বাহিনীর নেতা শেখ ফজলুল হক মনি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। জেনারেল ও'বানের তত্ত্বাবধানে এদেরকে বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে এদের অনেক সময় বিরোধ এমনকি সংঘর্ষও হতো। তাতে মুক্তিযুদ্ধ প্রচেষ্টা বেশ খানিকটা ব্যাহত হতো। এরা নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রী বললেও অন্য বামপন্থীদেরকে মোটেই সহ্য করতে পারতো না এবং ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির যুবকদের ট্রেনিংয়ের ঘোর বিরোধী ছিল। ভারতীয় প্রশাসনে ও রাজনৈতিক গ্রুপে ডানপন্থী চিন্তাধারার লোকেরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর ছিল। ট্রেনিংপ্রাপ্তদের মধ্যে বামপন্থীর অস্তিত্বকে তারা খুব সন্দেহের চোখে দেখতো। স্বাধীন বাংলায় সমাজতন্ত্রীদের শক্তিশালী হওয়াকে তারা ভারতের জন্য বিপদের কারণ বলে মনে করতো। মুজিব বাহিনীর ট্রেনিয়ের পেছনে এদেরই সমর্থন ছিল বেশী। তাজউদ্দিন সাহেব প্রথমাবধি এই বাহিনীকে বাংলাদেশ কমান্ডের অধীনে করার জন্য ভারত সরকারকে বার বার অনুরোধ জানিয়েও সফল হন নাই। বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যাপার দেখাশোনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত মিঃ ডি, পি, ধরের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত অক্টোবরের শেষদিকে এদেরকে মিসেস গান্ধীর বিশেষ আদেশে বাংলাদেশ কমান্ডের অধীন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের অগোচরে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি আর একটি বাহিনীকে ট্রেনিং দিয়ে কেন স্বতন্ত্র একটা সংগঠন দাঁড় করানো হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য কি ছিল সেটা আজও রহস্যাবৃত।

তবে আমার যেটুকু ধারণা এটা করা হয়েছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেটা হলো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার যদি ভারত সরকারের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী চলতে না চায় তখন তাকে নিজেদের একান্ত অনুগত এই বাহিনীর সাহায্যে অপসারিত করে নিজেদের পছন্দসই সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। তাজউদ্দিন সাহেবের চালচলন প্রথমাবধি তাদের মনে সন্দেহ জন্মায় যে এই লোক ভবিষ্যতে তাদের কথামত উঠতে-বসতে নাও পারে। তাদের এরূপ মনে করার কারণ সম্ভবত তারা তাজউদ্দিনের চরিত্রে কোন রকম দুর্বলতার চিহ্ন খুঁজে পায়নি বলে। ৮নং থিয়েটার রোডে তাজউদ্দিন সাহেবের নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত সিকিউরিটি

www.pathagar.com

অফিসার একদিন আমাকে বললেন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী একজন অদ্ভুত মানুষ। ইনি মদ খান না, পান-সিগারেট খান না, মেয়ে বান্ধবী নিয়ে ঘোরাফেরা করেন না যা আপনাদের নেতৃস্থানীয় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বেশী রকম করে থাকেন। তিনি সারাদিন কাজ নিয়ে থাকেন। গতকাল রাত্রে দেখলাম কাজ করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। গায়ের গরম চাদরখানাও টেনে নেওয়ার সুযোগ পাননি। আমি তাঁকে এইভাবে ঘুমোতে দেখে সন্তর্পণে চাদরখানা তাঁর গায়ের উপর টেনে দিলাম। আপনারা ভাগ্যবান যে এমন একজন নিষ্ঠাবান লোককে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন।

এপ্রিল মাসে প্রবাসী সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাদের পরিবারবর্গ কোলকাতায় এসে পৌঁছলেও কেউ পরিবারের সঙ্গে বাস করবেন না কারণ তখনকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা যখন পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করছে সে সময় পরিবার নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন নেতাদের পক্ষে অনুচিত হবে। ঐ সময় নেতাদের প্রায় সবাই থাকতেন ৮নং থিয়েটার রোডে। কিন্তু পরে যখন তাদের পরিবারবর্গ কোলকাতায় পৌঁছে সি, আই, টি রোডের আশু বাবুর ৮ তলা বাড়ীতে উঠলো তখন তাজউদ্দিন ও ওসমানী সাহেব ছাড়া সবাই প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করেন। ওসমানী সাহেব অবিবাহিত ছিলেন তাই তার পক্ষে থিয়েটার রোড ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু তাজউদ্দিন সাহেবের পরিবার মে মাসের মাঝামাঝি কোলকাতায় পৌঁছলেও তিনি একদিনের জন্যও পরিবারের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেননি। পরবর্তীকালে মন্ত্রিবর্গের বাসস্থান সি, আই, টি রোডের বাড়ীতে মন্ত্রিসভার বৈঠক যত রাত্রেই শেষ হোক না কেন সে বাড়ীরই একটি ফ্লাটে নিজের পরিবার থাকা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে রাত না কাটিয়ে তাজউদ্দিন সাহেব থিয়েটার রোডে চলে আসতেন এবং এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। আমার মনে হয় ভারত সরকার তাজউদ্দিন সাহেবের চরিত্রের এই বিশেষ দিকগুলি জানতে পারার পর ভাবলো এ ধরনের লোক সাধারণত একগুঁয়ে এবং শক্ত

www.pathagar.com

চরিত্রের মানুষ হয়। তাই স্বাধীনতার পর এই লোকটি সব সময় তাদের কথামত নাও চলতে পারে। তাই দরকারমত একে কাটছাঁট করার জন্য তার ঘোর বিরোধী একটি শক্তিকে হাতের পাঁচের মত রাখাই শ্রেয় মনে করেছিল। অবশ্য আমার এই ধারণা সঠিক নাও হতে পারে।

মুজিব বাহিনীর প্রধান নেতা শেখ ফজলুল হক মনি সামরিক বিভাগের কাছে কতটা মর্যাদার অধিকারী ছিল সেটা আমি বুঝলাম একবার আগরতলা বিমানবন্দরের একটি ঘটনা থেকে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে ২ নম্বর জোনের একটি আলোচনা সভায় যোগ দেওয়ার জন্য নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা জেলার সব প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের বিমানযোগে আগরতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ সময় একদিন শুনলাম যে আজ দুপুরে তাজউদ্দিন সাহেব আগরতলা আসবেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমরা তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিমানবন্দরে গিয়ে হাজির হলাম। নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে একটি সামরিক বিমান এসে নামলো। আমরা ভাবলাম তাজউদ্দিন সাহেব ঐ বিশেষ বিমানে এসেছেন। টার্মিনালের ঠিক সামনে প্লেনটি না থেমে খানিকটা দূরে থামলো। আমরা ভাবলাম যে সিকিউরিটির কারণেই বোধ হয় দূরে থেমেছে। একটি সামরিক জীপ বিমানটির দিকে এগিয়ে গেল। একটু পরে বিমানটি থেকে তাজউদ্দিন সাহেব না নেমে নামলো শেখ ফজলুল হক মনি। দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম। একজন কর্ণেল তাঁকে সমাদরে জীপে করে শহরের দিকে নিয়ে গেল। এরও প্রায় ঘন্টাখানিক পরে তাজউদ্দিন সাহেব এসে পৌঁছালেন একটি যাত্রীবাহী বিমানে। আমরা দেখে আশ্চর্য হলাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সামরিক বাহিনীর কোন উচ্চপদস্থ অফিসার উপস্থিত নেই। সাদা পোশাকে একজন লোক এসে তাজউদ্দিন সাহেবকে গাড়ীতে নিয়ে শহরের দিকে প্রস্থান করলো। যে অফিসারটির সংগে তাজউদ্দিন সাহেব গেলেন পোশাক-আশাকে তাঁকে খুব উচ্চপদস্থ অফিসার বলে মনে হলো না। তাঁর সঙ্গে কথা বলার আমাদের সুযোগ হলো না। দূর

www.pathagar.com

থেকে হাত নেড়ে আমরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানালাম। তিনিও হাত নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আগরতলায় মিটিং

২ নম্বর জোনের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের মিটিং বসেছিল আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী সচীন সিংহের বাসভবনে। আমরা সদস্যরা সংখ্যায় ছিলাম প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন। সদস্য ছাড়াও আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় কতিপয় জেলা কমিটির মেম্বারও ছিল। এই মিটিং আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ছাত্রলীগের সব নেতারাই হঠাৎ এসে হাজির হলো। তারা কিন্তু এ মিটিংয়ে আহূত ছিল না। তারা এসেই আমাদের মিটিং করার অধিকার চ্যালেঞ্জ করে বসল। কোন্ পরিচয়ে আমরা মিটিং করছি জানতে চাইল। তাদের বক্তব্য হলো তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে এই প্রবাসী সরকারকে তারা স্বীকার করে না। প্রবাসী সরকারের সদস্যবর্গসহ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে চোর, বাটপার, প্রতারক ইত্যাদি বলে এমন অশ্লীল ভাষায় আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ গালি দিতে আরম্ভ করলো যে আমরা লজ্জায় মাথা তুলতে পারলাম না। মাইকের গোটা দুই হর্ণ বাইরে বারান্দায় ফিট করা হয়েছিল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম রাস্তায় প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে গেছে বক্তৃতা শোনার জন্য। মাইকে এ সমস্ত কুৎসিৎ মন্তব্য পাবলিক যে বেশ উপভোগ করছে এটা বুঝতে পারলাম। বিদেশের মাটিতে এভাবে নিজেদের মধ্যে গালাগালি, কাদা ছোড়াছুড়ি যে আমাদিগকে ভারতীয়দের চোখে কতখানি হেয় করে ফেলেছিল ভেবে লজ্জায় মরে যেতে লাগলাম। আমাদের পক্ষ থেকে ঢাকার কালিয়াকৈর-শ্রীপুর এলাকার এম, এন, এ শামসুল হক ছাত্রদের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে বেশ জোরের সংগে বক্তৃতা করলেন কিন্তু ছাত্রনেতাদের জোরজবরদস্তি ও চেঁচামেচিতে মিটিং করা সম্ভব হলো না। মিটিং অসমাপ্ত রেখে বেরিয়ে আসলাম।

www.pathagar.com

এই আগরতলায় আমরা কয়েকদিন ছিলাম। এখানে নোয়াখালী জেলার অনেক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন; তাদের সংগে দেখা হলো। এদের মধ্যে ছিল কোম্পানীগঞ্জের আলী ইমাম চৌধুরী, বেগমগঞ্জের প্রফেসর হানিফ এম, এন, এ, সদরের আজিজুল হক এম, এ; কারি করিমুল্লা প্রমুখ। এরা উদয়পুরের কয়েকটি শরণার্থী শিবির পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। এখানে আমাদের পার্শ্ববর্তী হাজির-পাড়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা কাজি আনোয়ারুল্লাহর সঙ্গে দেখা হলো। রামগঞ্জ, রায়পুর ও চাটখিল এলাকার বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার লুৎফর রহমানেরও এখানে দেখা পেলাম। সুবেদার লুৎফর রহমান টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দীকির মতো দেশের ভিতর থেকেই হানাদার বাহিনীর সঙ্গে অসম সাহসিকতার সঙ্গে প্রথম থেকেই যুদ্ধ করে আসছিলেন। ইনি একজন ই, পি, আর-এর লোক। বর্ডার অতিক্রম করে আগরতলায় ই, পি, আর বাহিনীতে যোগ না দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যুবকদের সংগঠিত করে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথম দিকে হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধ করছিলেন। পরে মাঝে মাঝে আগরতলায় এসে কিছু উন্নত ধরনের অস্ত্র নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর বাহিনীর সক্রিয় ও কার্যকরী প্রতিরোধের ফলে পাকবাহিনী অভ্যন্তরে বেশীদূর ঢুকতে সাহস করেনি। ফলে বেগমগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরার একটা বিরাট অংশ হানাদার বাহিনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। সুবেদার লুৎফর রহমানের সঙ্গে আরও অনেকের মধ্যে লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আকতারুজ্জমানও ছিলেন। স্বাধীনতার পর সুবেদার লুৎফর রহমানকে আনারারী ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল্লাহ এসেছিল দেশের ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। এসব অস্ত্র এরা রাতে বহন করতো। রাতে হানাদার বাহিনী বাংকারে আশ্রয় নেয় – বাইরে কেউ থাকে না। শুধু রাজাকারেরা রাস্তা ও সেতু পাহারায় থাকে। এরা অস্ত্র নিয়ে

www.pathagar.com

যতদূর সম্ভব পাকা রাস্তা এড়িয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে চলাচল করতো। পথে পথে এদের কয়েকটি ঘাটি ছিল যেখানে মুক্তিবাহিনীর যুবকেরা দিনের বেলায় আশ্রয় পেত। কাজি আনোয়ারুল্লাহ ও তার সঙ্গীরা এইসব অস্ত্র নিয়ে পথে দুই-একদিন থেমে নিজের এলাকায় পৌঁছাতো। তার কাছে শুনলাম আমার সেজোভাই মকুমিয়া যে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিল তাকে আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে কিছুদিন পূর্বে আর্মি ধরে নিয়ে গেছে। কয়েকদিন হয় তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তার রক্তমাখা শার্ট ও লুঙ্গি নাকি আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শুনে মনে ভীষণ আঘাত পেলাম। আমাদের বাড়ীতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং হয়েছিল এবং আমার ভাই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট তাই তার যে রেহাই নাই সেটা আমি পূর্বেই বুঝেছিলাম। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিল বলে সে আমার বুড়ো মা ও নিজের পরিবার ফেলে পালিয়ে যেতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের সাহায্য

যা হোক, সুখের বিষয় পরে জানতে পেরেছিলাম আমার ভাইকে দিন দশেক আটকিয়ে রেখে পরে ছেড়ে দেয়া হয়। তার মুক্তির পেছনে যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কারণে সবচাইতে বেশী সাহায্য করেছিল সে হলো হানাদার বাহিনীর সঙ্গে আমাদের থানার সবচাইতে সক্রিয় সহযোগী আবদুল জলিল ওরফে দত্তপাড়া ইউনিয়নের ননি চেয়ারম্যান। এই লোকটিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা গুলি করে হত্যা করে তার লাশ সপ্তাহখানেক পর্যন্ত গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এছাড়া আমার এক চাচাতো বোনের স্বামী মরহুম লুৎফুল হক ওরফে মুনসুর মিয়া যিনি বরাবর করাচীর জাহাঙ্গীর রোডে থাকতেন এবং ভালো উর্দু ও পাঞ্জাবী বলতে পারতেন তাঁর সাহায্যও অনেকটা কাজ করেছিল। ইনি ২৫শে মার্চের কয়েক দিন পূর্বে তাঁর করাচীর বাড়ী ও হোটেল ব্যবসা ফেলে সপরিবারে দেশে চলে আসেন। কাজি

www.pathagar.com

আনোয়ারুল্লার কাছে শুনলাম তাদের আগরতলা থেকে ৪০/৫০ মাইল বিস্তৃত গন্তব্যপথে বহু জায়গাতেই রাজাকারদের সঙ্গে দেখা হয়। সব রাজাকারই যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছিল এমন নয়। অনেকে ভিতরে ভিতরে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। শুধু পেটের দায়ে বা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তির চাপে পড়ে রাজাকারের চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকে সীমান্ত অতিক্রমে ইচ্ছুক বহু হিন্দু-মুসলমান পরিবারকে সাহায্য করেছিল। কাজি আনোয়ারুল্লা বলেছিল মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সহানুভূতিশীল রাজাকারদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং কোন্ রাতে কার কোথায় ডিউটি পড়বে এটাও তাদের জানা থাকতো। সে অনুসারে তারা অস্ত্রের জন্য আগরতলায় যাতায়াত করতো। এ ধরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশের আরো অনেক জায়গাতেই তখন চালু ছিল বলে শুনেছি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমার নিজের এলাকা ও অন্যান্য স্থানে দায়িত্বশীল লোকদের সঙ্গে আলাপ করে অনেক রাজাকারই যে পেটের দায়ে ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে পড়ে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল এটা জানতে পেরেছিলাম। স্বাধীনতার পরপরই এসব রাজাকারদের অনেককেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। দুঃখ লাগে যখন পরে দেখলাম যে, এইসব নিরীহ যুবকদের রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য যেসব প্রভাবশালী ব্যক্তি বাধ্য করেছিল তাদের প্রায় কারোরই কোন ক্ষতি হয়নি। আওয়ামী লীগের নেতা বা মুক্তিবাহিনীর যুবকদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন বলে তারা নানা কায়দায় আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত রয়েছে। মাঝখান থেকে কিছু নিরীহ কৃষক সন্তান নিজেদের প্রাণ দিয়ে ধনী ও প্রভাবশালীদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো।

এইরূপ একজন নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধা কাজি আনোয়া-রুল্লাহও স্বাধীনতার পর বেশী দিন বাঁচতে পারেনি। নিজের এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে চোর-ডাকাত দমন

www.pathagar.com

করতে গিয়ে স্থানীয় দুস্কৃতিকারীদের বিরাগভাজন হয়। একদিন তাঁর বাড়ীর পাশের এক ডাকাতের দল তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে।

আগরতলায় ভারতীয় নাগরিক ও উদ্বাস্তুদের সংখ্যা তখন প্রায় সমান সমান। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা হয়তো কিছুটা বেশীও হতে পারে। আগরতলায় আমরা দু'বার গিয়েছিলাম। একবার বোধ হয় জুন মাসের শেষভাগে, অন্যবার সেপ্টেম্বরের শেষদিকে। প্রথমবার অন্য মেম্বারদের সঙ্গে রেস্টহাউজে ছিলাম। দ্বিতীয়বার ছিলাম আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে রামনগর নামক একটি স্থানে। এখানে একটি ছোট তিন কামরার টিনের ঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন ঢাকার ওয়াপদা অফিসে কর্মরত আমার এক মামা নূরুল হুদা সাহেব। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তার মেঝো ছেলে ফ্লাইং অফিসার সুলতান মাহমুদ পাকিস্তান বিমান বাহিনী থেকে ডিফেক্ট করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এটা জানতে পেরেই পাক বাহিনীর নির্যাতনের ভয়ে তিনি বহু কষ্টে সপরিবারে আগরতলায় পালিয়ে আসেন। তার পরিবারে তখন ছিল বড় ছেলে নুরউদ্দিন, ছোট ছেলে মামুন, দুই পুত্রবধূ, একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা আরজু ও নিজের স্ত্রী। আমি যখন তাদের সঙ্গে রামনগরের বাসায় ছিলাম তখন সুলতান মাহমুদ ডিমাপুরে স্কোয়াড্রন লিডার হিসাবে সদ্যগঠিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ইনচার্জ ও বড় ছেলে নুরুদ্দিন সিলেট তিন নম্বর জোনে মেজর শফিউল্লাহর অধীনে তার প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করছিল। রামনগরের এই ছোট টিনের ঘরটিতে বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা ছিল। বাইরের কামরায় আমরা তিন-চারজন মেঝের উপরে চাদর বিছিয়ে শুতাম। ওখানে থাকাকালীন সময়ে বর্ডারের সংঘর্ষ খুব তীব্র আকার ধারণ করে। পরপর দু'দিন আগরতলার উপকণ্ঠে পাকবাহিনীর শেল এসে বিদীর্ণ হয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি করে। তখন আগরতলায় দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আমরা নিজেরা খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের দুঃখ, কষ্ট ও আতংক সবকিছু আমাদেরই জন্য।

www.pathagar.com

অত উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বাজারে নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম অনেক বেড়ে যাচ্ছিল। তাতে স্থানীয় অধিবাসীদের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। আগরতলার অধিবাসীদের অধিকাংশই যেহেতু বাংগালী এবং এটা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল তাই একটা অন্তর্নিহিত নাড়ির টানে সবাই দুঃখকষ্টকে হাসিমুখে বরণ করছিল। এদের কাছে যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা কতটা ঋণী এবং এদের আশা-আকাঙ্খাকে ব্যর্থ করে দিয়ে এদেরকে আমরা কতখানি দুঃখ দিয়েছি এসব কথা ভাবলে আজ লজ্জাবোধ হয়।

মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

আমি কোলকাতা পৌঁছার কিছুদিন পর রোমে রবিউদ্দিনকে এক পত্রে আমার কোলকাতা পৌঁছার খবর দেই। সে পত্রের মধ্যে ঢাকায় আমার ছোটভাই মুকিতের কাছেও এক পত্র দিয়েছিলাম। জুলাইয়ের প্রথম দিকে রবিউদ্দিনের পত্রের সঙ্গে সে পত্রের উত্তর পাই। তাতে জানতে পারলাম আমার পরিবারের লোকেরা সুস্থ আছে কিন্তু আমার জন্য তারা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এর মধ্যে জুলাইয়ের মাঝামাঝি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য রবি কোলকাতায় চলে আসে। পূর্বেই বলেছি পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান আমাদের আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল না হলেও রবি ও রফিক দুই ভাই সি, পি, আই-এর সংগে ঘনিষ্ঠ থাকায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। রবিউদ্দিন পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আমাদের আন্দোলনের প্রতি জনমত গড়ে তুলতে লাগল। ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, মধ্য কলিকাতায় যে সমস্ত সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য গোষ্ঠী ছিল তাদের সংগে যোগাযোগের মারফৎ বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করে শিক্ষিত মহলে আমাদের দাবী ও সংগ্রামের যৌক্তিকতা বুঝাতে লাগলো। ঐ সময় এই প্রচারকার্যের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই সময়টাতে নকসাল আন্দোলন পশ্চিম বঙ্গে খুব জোরদার হয়ে শিক্ষিত

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চারু মজুমদারের নকসালী চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রসার ঘটায়।

নকসালীরা চীনপন্থী হওয়ায় আমাদের আন্দোলনের বিরোধী ছিল। সি, পি, এম-এর লোকেরাও বাহ্যত আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করলেও আমাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। আওয়ামী লীগ মুখ্যত বুর্জুয়াদের পার্টি এবং তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকের কোন কাজে আসবে না এই ধারণায় তারা আমাদের সংগ্রামকে স্বাগত জানানো থেকে বিরত থাকে। শুধু ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকেরাই মনেপ্রাণে আমাদের সমর্থন দেয়। ইন্দিরা কংগ্রেস যেহেতু তখন কেন্দ্র ও পশ্চিম বঙ্গে ক্ষমতাসীন ছিল তাই সর্বত্র প্রশাসন ও অধিকাংশ জনগণের কাছ থেকে জয়বাংলার দেশের লোক হিসাবে আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি পেতাম। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ সি, পি, এম-এর সমর্থক হলেও তাদের অধিকাংশ পূর্ব বঙ্গ থেকে হিজরত করেছে বলে পূর্ব বঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাদের একটা সহজাত সহানুভূতি ছিল। ছয় দফা আন্দোলনের মূল ভিত্তি যেহেতু ছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ তাই পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরাও সাময়িকভাবে হলেও ঐ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। এই সংগ্রামকে তাদের অনেকে নিজেদের সংগ্রাম বলেই অবচেতন মনে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাই আদর্শগত রাজনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণে কৃষক-শ্রমিকের সাথে সম্পর্কহীন বুর্জুয়া আন্দোলন মনে করলেও পশ্চিমাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাভাষীদের আন্দোলন হিসাবে মনে মনে একে স্বাগত না জানিয়ে পারছিল না। বোধ হয় নিজের দেশে তারা পশ্চিমা আধিপত্যের শিকার হয়ে ঐ আধিপত্যের প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ মনে মনে পোষণ করতো পূর্ব বঙ্গে তাদের বাঙ্গালী ভাইদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রেরণা ঐ মনোভাব থেকেই খুব সম্ভব উজ্জীবিত হয়েছিল।

রবিউদ্দিন তার নিজের বাসায় প্রায়ই কোলকাতার বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিয়ে আলোচনা সভা করতো।

www.pathagar.com

ঐসব বৈঠকে দেশ বিভাগের পরপর পঞ্চাশ বা চৌষট্টি সনের দাঙ্গার পর সীমান্তের এপারে চলে এসেছে এরূপ অনেক পুরুষ ও মহিলা যোগ দিতেন। আমি লক্ষ্য করেছি তাদের মধ্যে অনেকেরই মনে মনে ধারণা রয়েছে যে এটা যেহেতু বাঙ্গালীদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, সীমান্তের এপারে ওপারে সবাই যখন বাঙ্গালী তখন দেশ স্বাধীন হলে এটা বাঙ্গালীদের রাষ্ট্র হবে। তখন এপারের ওপারের মধ্যে যাতায়াতে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি অনুভব করেছি বাংলাদেশের জন্য যারা খাটছেন, ত্যাগ স্বীকার করছেন, নিজেদের সীমিত সম্পদ থেকেও অতিকষ্টে কিছুটা দান করছেন তাদের অধিকাংশেরই মনে একটা গোপন আশা রয়েছে-- এতদিনে বাঙ্গালীদের নিজস্ব রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে, যে রাষ্ট্র হবে তাদের একান্ত আপনার। পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব বঙ্গের সব বাঙ্গালীরাই হবে এর মালিক, এর বাসিন্দা ও নাগরিক। কিন্তু আমি জানতাম প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে তাতে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হবে; পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ মিলে এক রাষ্ট্র হবে না। ২৫শে মার্চের পরে যারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে শুধু তারাই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে ফিরে যেতে পারবে এবং সে দেশের নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হবে, আগে যারা এসেছে তারা নয়।

কিন্তু সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে যে মনোভাবের অনুভূতি দেখতে পেতাম তা আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করতো। তখনই তাদের মোহ ভাংগাতে আমার ইচ্ছা করতো না। অনেক সময় আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি - রবি ভাই, দেশ স্বাধীন হলে আমরা দেশে ফিরতে পারবো তো? একদিন এক ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-- ভাই বরিশালে আমাদের বাড়ীর সামনে বিরাট নারকেল বাগান ছিল। দেশে ফিরলে সে নারকেল গাছগুলো আবার ফিরে পাবো তো? আমার উত্তর দিতে কষ্ট হচ্ছিল-- কি করে তাদের বলি দেশ স্বাধীন হলে '৭১ সনের হত্যাকান্ডের পূর্বে যারা দেশ ছেড়েছেন তাঁরা ফিরতে পারবেন না। '৭১ সনের মার্চের পরে যারা এসেছেন তাঁরাই শুধু পারবেন।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর এক রাষ্ট্র হয়ে যাবে এবং সব বাঙ্গালী এর নাগরিক হতে পারবে এ ধারণা যে শুধু অশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ছিল তা নয়, শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও এ ধারণা পোষণ করতে আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি। ঐ সময় কোলকাতা থাকাকালীন বাংলাদেশের সব প্রবাসী নাগরিককেই থিয়েটার রোডের ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসে মাসে একবার গিয়ে তাদের রেসিডেন্সিয়াল পারমিট রিনিউ করাতে হতো। ঐ অফিসে কয়েকমাস ধরে যাতায়াত করার ফলে অনেক অফিসারের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। আমি পরিষদ সদস্য ছিলাম জানতে পেরে তাঁরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে এক-আধটু রাজনৈতিক আলোচনাও করতেন। একদিন আমাকে এক অফিসার একখানা দরখাস্ত দেখিয়ে হেসে বললেন, আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে অশিক্ষিত লোকের ধারণার কথা বাদ দিন, শিক্ষিত লোকের ধারণাও যে কত আজগুবি এই দরখাস্তখানা পড়লে বুঝতে পারবেন। বর্ধমান থেকে এক সাব-ইন্সপেক্টর লিখেছেন তাকে যশোর বদলী করবার জন্য। অর্থাৎ তার ধারণা যুদ্ধ শেষ হলেই দু'বাংলা এক হয়ে যাচ্ছে। মশায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুস্কিলে পড়বেন আপনারা।

দেশ স্বাধীন হলে সত্যিই আমরা বহু স্থানে বহুবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমার নিজের এলাকায় নোয়াখালীর মান্দারী বাজারে '৭২ সনের প্রথম দিকে কয়েকজন দোকানদার এসে একটা ব্যাপারে নিষ্পত্তি করার জন্য আমাকে নিয়ে যায়। গিয়ে দেখি সেখানে অনেক লোক জড় হয়েছে। ব্যাপার হলো, একটি হিন্দু যুবক '৬৪ সনের দাঙ্গার পর তার দোকানের ভিটি অন্য দোকানদারের কাছে বিক্রি করে ভারতে চলে যায়। এতদিন পর '৭২-এর জানুয়ারী মাসে সে এসে তার ভিটি ফেরৎ চাইছে। আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম সে এতদিন কোথায় ছিল। সে বলল রংপুরে। আমি বুঝলাম মিথ্যা কথা বলছে। এই লোকটির বড় ভাই কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি। মান্দারী বাজারে সে তখনও দোকান চালাচ্ছে। আমি তাকে যখন সত্য ঘটনা জিজ্ঞাসা করলাম, সে স্বীকার করল তার ভাই সত্যিই

www.pathagar.com

ভিটি বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে গিয়েছিল। স্থানীয় একজন ইউনিয়ন কাউন্সিলের হিন্দু মেম্বারও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও যুবকটিকে এখানে যেসব হিন্দু ব্যবসায়ী মুসলমানদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিতে বাস করছে তাদের মধ্যে মিথ্যা অজুহাতে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসার জন্য খুব বকাবকি করলেন। যাই হোক কোন দিক থেকে কোন সমর্থন না পেয়ে বিশেষ করে স্থানীয় হিন্দুদের চাপে পড়ে যুবকটি সামান্য কিছু টাকা নিয়ে আবার ভারতে চলে গেল। শুধু মান্দারী বাজারে নয় আরো দু'একটি ইউনিয়নে বহুদিন পূর্বে জমিজমা বেচে ভারতে চলে যাওয়া দু'চার জন লোক এসে তাদের জমিজমা ফেরৎ চেয়ে বহু অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বহু কষ্টে এইসব সমস্যার আমরা শেষ পর্যন্ত সমাধান করেছি। শুধু আমার এলাকায় নয়, অন্যান্য বহু এলাকা ও জেলাগুলোতেও নাকি এরূপ বহু বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ়তা এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনে পূর্ণ সহযোগিতার ফলে সবক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়।

সীমান্ত অতিক্রমের পরই আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্তরা প্রথম বুঝতে পারলাম পশ্চিম বঙ্গের মধ্যবিত্তদের চাইতে আমরা কত সুখে ও আরামে ছিলাম। তুলনামূলকভাবে তাদের চাইতে আমাদের আর্থিক অবস্থা কতখানি উন্নত ছিল। তখনও বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের অনেক লোকের ঘরে টিভি ও ফ্রিজ ছিল। কিন্তু সীমান্তের ওপারে গিয়ে দেখলাম ফ্রিজ, টিভি শতকরা আশিজনের ঘরেই নেই। আমাদের ধারণাতে এ বিভ্রান্তির কারণ হলো আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের তুলনা করেছি পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চমধ্যবিত্তদের সঙ্গে। পশ্চিম পাকিস্তানে নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বলে কিছু ছিল না, ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালী শ্রেণী। আর ছিল একেবারে দরিদ্র গোষ্ঠী। তাই উচ্চমধ্যবিত্ত ও বিত্তশালীদের সংগে নিজেদের তুলনা করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সংগ্রামে নেমেছিলাম। কিন্তু কোলকাতার বাঙ্গালী

www.pathagar.com

মধ্যবিত্তদের জীবন সংগ্রামের চেহারা ও কঠোরতা দেখে আমাদের অনেককেই ধারণা বদলাতে হলো। এরূপ কঠোর জীবন সংগ্রাম ও আর্থিক অনটনের মধ্যেও প্রতিটি হিন্দু বাঙ্গালী পরিবার যতটুকু সম্ভব আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করেছে।

লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে পশ্চিম বঙ্গের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যেতে লাগলো। এটা সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য খুব কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তথাপি পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মানুষ তা হাসিমুখে সহ্য করেছে। আমাদের আন্দোলনের কট্টর বিরোধীরা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের কষ্টকে একটা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তুলে ধরে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একটা আন্তরিক নাড়ীর টান থাকায় বিরুদ্ধবাদীদের চেষ্টা সফল হয়নি। জুলাই-আগস্টের দিকে যখন বরিশাল, ফরিদপুর এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে নমশূদ্র উদ্বাস্তুরা আসতে আরম্ভ করলো তখন পশ্চিম বঙ্গে যে কোন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমরা আতঙ্কিত থাকতাম। প্রায়ই শুনতাম আজকালের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে। এদেশ থেকে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হাজার দু'হাজার নমশূদ্র সীমান্ত অতিক্রম করেই নাকি বলতো এখানে মুসলমানদের বাড়ী কোথায় আছে দেখিয়ে দাও তারপর অন্য কথা। মুসলমানদের মেরে তাড়িয়ে সেসব বাড়ীঘর দখল করাটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তখন কংগ্রেস ও সি, পি, এম কর্মীরা হাতজোড় করে বহু অনুরোধের পর তাদেরকে ঠাণ্ডা করতে সমর্থ হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কর্তাদের বোধ হয় ধারণা ছিল হিন্দু অধিবাসীদের মেরে তাড়ালে, ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিলে তারা পশ্চিম বঙ্গে এসে দাঙ্গা বাধাবে। এতে বিপুল পরিমাণ মুসলমান অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেবে। এভাবে কয়েক লক্ষ মুসলমান উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলায় আশ্রয় নিলে এখানে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে।

www.pathagar.com

তখন কোথায় যাবে স্বাধীনতার আন্দোলন, কোথায় যাবে মুক্তিযুদ্ধ! সব আন্দোলনই নতুন পরিস্থিতির ডামাডোলে তলিয়ে যাবে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক সচেতন জনগণ ও কর্মীদের হস্তক্ষেপে দাঙ্গা বাধানো সম্ভব হলো না। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ঐ তিনমাস দাঙ্গা লাগার আতঙ্কে দারুণ মানসিক টেনশনের ভিতর দিয়ে আমাদের কেটেছে। ইয়াহিয়া খানের এই হিন্দু বিতাড়ন করে দাঙ্গা সৃষ্টির অপচেষ্টা পরবর্তীকালে তার জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাক সরকার যদি শুধু আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতো, যাদের নব্বই জনই ছিল মুসলমান, তা হলে এত লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করতো না এবং মিসেস গান্ধীর পক্ষেও সামরিক হস্তক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুযোগ হতো না। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের ভুল পদক্ষেপই মিসেস গান্ধীর হাতে পাকিস্তান ভাঙ্গার একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

মুক্তিযুদ্ধের ঐ নয় মাসের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারত সরকার জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত আশা করেছিল পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে একটা রাজনৈতিক সমাধানে আসবে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার হবে ভারতের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার যারা ঐ দুঃসময়ে ভারতের সামরিক ও নৈতিক সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করবে। পাকিস্তান না ভাঙলেও পূর্বাঞ্চলে তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এতবড় একটা জনগোষ্ঠীর অবস্থানের মূল্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের কাছে ছিল অপরিসীম। কিন্তু ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক সমাধান না করে সামরিক সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এটা যখন ভারত নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল তখন তারা বাংলাদেশ স্বাধীন করে শরণার্থীদের দেশে ফেরৎ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কোন সামরিক ব্যবস্থা নিতে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। যুদ্ধ বাধলে তা হবে

www.pathagar.com

পাক-ভারত উপমহাদেশে দুই শক্তির লড়াই, পূর্ব পাকিস্তানের লোকের স্বাধীনতার লড়াই নয়--এটা দুনিয়ার কাছে প্রতীয়মান হলেই রাশিয়া, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি বৃহৎশক্তিদের আন্তর্জাতিক চাপে দু'দিন আগে-পরে ভারতকে যুদ্ধবিরতির আদেশ মেনে নিতে হবে। পাক-ভারত সীমান্তে তখন হয়তো জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক পরিদর্শক নিযুক্ত হবে। তাতে শরণার্থী সমস্যার কোন সমাধান হবে না। উদ্বাস্তুরাও দেশে ফিরতে পারবে না। মাবখান থেকে মুক্তিযুদ্ধকে ভারত যেভাবে সাহায্য করছিল তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ভারত চাচ্ছিল এ সংঘর্ষ যেন কোনভাবেই আন্তর্জাতিক রূপ না নেয়।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আরম্ভ হলে জাতিসংঘ ও অন্যান্য পরাশক্তির হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি ঘটবার আগেই পূর্ব পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিয়ে যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে তড়িৎগতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গেলে প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তখন নিয়াজীর সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন ডিভিশন। এদের অতি অল্প সময়ে পরাজিত করতে হলে তিনগুণ অর্থাৎ নয় ডিভিশন সৈন্যের প্রয়োজন। তখনও শীতকাল আরম্ভ হয়নি, উত্তরে হিমালয়ের গিরিপথগুলি তখনো বরফাচ্ছন্ন হয়নি। সম্ভাব্য চীনা আক্রমণ রোখার জন্য সেখানে বরাবর ছয় ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন থাকে। গিরিপথ বরফাচ্ছন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত চীন যে কোন সময়ে ঐ গিরিপথ দিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে ভারতের আক্রমণে হস্তক্ষেপ করে বসতে পারে। তাই গিরিপথ বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঐ ছয় ডিভিশনকে পূর্ব ফ্রন্টে আক্রমণের জন্য সরিয়ে আনতে পারছিল না। এই অবস্থায় ভারতকে কোন বড় ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছিল।

এ লক্ষ্যে ভারত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে একদিকে মুক্তি-বাহিনীর ট্রেনিয়ের ব্যবস্থা জোরদার অন্যদিকে ভারতের সম্ভাব্য পদক্ষেপের সপক্ষে বিশ্বে জোর প্রচারকার্য আরম্ভ করলো। পাক-

www.pathagar.com

ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হলে আমেরিকা ও চীনের ভূমিকা কি হবে এটাই তখন খুব গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা হচ্ছিল। চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রথম থেকে সমর্থন না করলেও পাক জান্তার সমস্যার সামরিক সমাধানকে সমর্থন করছিল না এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ভারতের কড়া সমালোচনা করলেও আগস্ট-সেপ্টেম্বরের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের লোকের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি চীনের পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার ধার অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসছিল। এই আন্দোলনের পিছনে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের সমর্থন রয়েছে এটা চীন বুঝতে পেরেছিল। চীনের প্রেসিডেন্ট মাও-সেতুং-এর নিকট মওলানা ভাসানীর প্রেরিত অনেকগুলি টেলিগ্রাম ও চীনের সমর্থক বামপন্থী কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রকাশিত আবেদনসমূহ চীনের এইরূপ নমনীয় মনোভাব গ্রহণের পেছনে অনেকটা কাজ করেছিল বলে মনে হয়। মুখে যাই বলুক কাজের বেলায় আমেরিকা ও চীন তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসবে কিনা সেটাই গভীর মনোযোগের সংগে বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছিল।

চীন যদি সামরিক হস্তক্ষেপে এগিয়ে না আসে তবে আমেরিকা কতটুকু আসবে সেটাও ভেবে দেখা হচ্ছিল। আমেরিকা সামরিক শক্তিতে যেরূপ প্রবল তাতে সে একলাই হস্তক্ষেপ করে অবস্থা পাকিস্তানের অনুকূলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে সময় ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মার্কিন জনমত এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে অন্য কোন দেশে আমেরিকা নতুনভাবে সামরিক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়তে সাহস করবে কিনা সন্দেহ ছিল। এ ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সব প্রভাবশালী পত্রিকাতেই পাক সরকারের চন্ডনীতি ও হত্যাকান্ডের কঠোর সমালোচনা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তাঁর পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শদাতা কিসিঞ্জার প্রয়োজনে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছুক থাকলেও আমেরিকান জনমতের বিরুদ্ধে খুব বেশী দূর যেতে সাহস করবে না বলে ভারত সরকার ধারণা করে

www.pathagar.com

নিল। তথাপি কোন কারণে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ও চীন সত্যিই যদি পাকিস্তানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তখন রাশিয়ার মত একটি পরাশক্তির সাহায্যই শুধু তাকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই পাকিস্তানের সংগে খোলাখুলি সংঘর্ষে নামার পূর্বে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে একটা নিশ্চিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল।

এশিয়াতে ভারতই মস্কোর সর্ববৃহৎ বিশ্বস্ত বন্ধু। তাই যেভাবে হোক তাকে বিপদমুক্ত করার একটা নৈতিক দায়িত্ব রাশিয়ার রয়েছে। রাশিয়া প্রথমাবধি পূর্ব পাকিস্তানের এ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এপ্রিলের প্রথম থেকেই পাক জান্তার গণহত্যার প্রতিবাদ করে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন সংকটের রাজনৈতিক সমাধান করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানান। সমাধানের সে পথে না গিয়ে ক্রমাগত চন্ডনীতি চালিয়ে ভারতের ঘাড়ে এক বিরাট ও জটিল শরণার্থী সমস্যা চাপিয়ে দেওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থীতিশীলতা সম্পর্কে রাশিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। বিপুল পরিমাণ শরণার্থীর চাপে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এ অবস্থায় পাকিস্তান যখন কিছুতেই রাজনৈতিক সমাধানে রাজী হবে না বলে রাশিয়া স্থিরনিশ্চিত হলো তখন চীন ও আমেরিকার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সক্রিয় সাহায্য দিতে সে প্রতিশ্রুত হলো।

আগস্টের ৯ তারিখে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্তও রাশিয়া আশা করেছিল যে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে একটা রাজনৈতিক সমাধানে রাজী হবে। তাই সেপ্টেম্বরের শেষ এমনকি অক্টোবরের প্রথম দিক পর্যন্ত পূর্ব সীমান্তে ভারতকে এমন কোন বৃহৎ সামরিক পদক্ষেপ নিতে রাশিয়া নিষেধ করেছিল যাতে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ বেধে যায়। জুন-জুলাই পর্যন্ত রাশিয়া ও ভারত আশংকা করেছিল ব্যাপারটাকে আন্তর্জাতিক করণের জন্য

www.pathagar.com

পাকিস্তান পূর্ব সীমান্তে আক্রমণ করে বসতে পারে। ঐ সময় আক্রমণ হলে ভারত সরকার খুবই বেকায়দায় পড়ে যেত। যুদ্ধের জন্য যেহেতু ভারত প্রস্তুত ছিল না, উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য ও সমরাস্ত্রের যোগাড়ও ছিল না তাই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আক্রমণ হলে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হতো। তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুব সম্ভব আন্তর্জাতিক রূপ নিয়ে আমাদের জন্য একটা মহা সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি করতো। খুব সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানে তখনো তিন ডিভিশন পুরোপুরি গঠিত বা অস্ত্রসজ্জিত হয়নি অথবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়াজী তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করে সবকিছু ঠিক করে ফেলেছে বলে রাওয়ালপিন্ডি হেডকোয়ার্টারে যেসব মিথ্যা ও বানানো খবর পাঠাতো তাতে সমস্যাকে আন্তর্জাতিক করণের জন্য পাক-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ করার প্রয়োজন পাকিস্তান মনে করেনি। পাকিস্তান আক্রমণ করলে বন্ধু চীন উত্তরের গিরিপথ দিয়ে অতিসহজে তার সাহায্যে সৈন্য পাঠাতে পারে আশংকা করে সোভিয়েত সরকার আগস্টের প্রথমেই ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে ফেলে যাতে রুশ-চীন সীমান্তে নিয়োজিত পঞ্চাশ ডিভিশন সোভিয়েত সৈন্য ও চীনের দিকে তাক করা শত শত ক্ষেপণাস্ত্রের ভয়ে চীন কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস না করে।

অক্টোবরের শেষদিকে ভারত পাকিস্তান উভয়ে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের কাজ শেষ করে ফেলল। ভারত বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে আসল যুদ্ধ হবে পশ্চিম সীমান্তে। পূর্ব সীমান্তে তাদের ভূমিকা হবে অনেকটা আত্মরক্ষামূলক। পাকিস্তান চাইবে তীব্রগতিতে যুদ্ধ আরম্ভ করে অল্প সময়ে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কিছু অংশ দখল করে নিতে যাতে যুদ্ধবিরতির পর পূর্ব সীমান্তে কিছু ভূমি হারালেও তা ফেরৎ পেতে পারে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ভারতের জন্য অসুবিধা, যুদ্ধবিরতির পূর্বেই পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধ শেষ করতে হবে এই মনে করে প্রায় ৬টি ডিভিশন সে নিয়োজিত করলো তড়িৎগতিতে ঢাকা দখল করে নেওয়ার জন্য। পশ্চিম সীমান্তে ভারতের নীতি হবে প্রতিরোধমূলক, পূর্ব সীমান্তে হবে আক্র-মণাত্মক। ভারত চাচ্ছিল পাকিস্তান প্রথমে আক্রমণ আরম্ভ করুক

www.pathagar.com

যাতে আক্রমণকারী হিসাবে বিশ্বজনমত তার বিরুদ্ধে চলে যায়। ভারতের সামরিক কৌশল ছিল মুক্তিবাহিনীর অনবরত আক্রমণে পূর্ব পাকিস্তানের পাক সেনাদেরকে ক্রমাগত দুর্বল ও হতাশাগ্রস্ত করে ফেলা যাতে যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই মুক্তিবাহিনী ও ভারতের নিয়মিত বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাক বাহিনীকে পরাস্ত করা যায়। দ্রুত সৈন্য পরিচালনার জন্য শীতকালই উপযুক্ত সময় যখন নদীনালাপরিপূর্ণ পূর্ববাংলার পথঘাট শুষ্ক থাকে। অতএব ডিসেম্বর-জানুয়ারীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। ভারতীয় সমরবিদরা শীতকালকে সঠিক সময় হিসাবে বেছে নেওয়ার আরো একটি কারণ হলো যে চীনের কোনভাবে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা থাকলেও ঐ সময় হিমালয়ের প্রত্যেকটি গিরিপথ বরফাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বলে চীনা বাহিনীর পক্ষে ঐ সময়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা সম্ভব হবে না। নভেম্বর মাস পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারের মত মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং শেষ হলো এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের ভিতরে পারফরমেন্সও খুব ভাল দেখা যেতে লাগল। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছিল। রাতের বেলায় তাদের চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে সে সময় বাংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। এতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ খুব উৎসাহিত বোধ করলো। ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে যুদ্ধ আরম্ভ হলে লাখ খানেক মুক্তিবাহিনী ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েক হাজার নিয়মিত সৈন্যের পেছনে কয়েক ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য এগিয়ে গেলেও এটা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের স্বদেশ দখলের লড়াইয়ের মতই দেখাবে, ভারতীয় আক্রমণ বলে আর মনে হবে না।

শিলিগুড়িতে মিটিং

যুদ্ধ পরিচালনা বা প্রস্তুতির জন্য কোন ওয়ার কাউন্সিল গঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারই প্রধানত তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব পালন করছিলেন। আওয়ামী লীগ পার্টি বরাবরই চেষ্টা করে

www.pathagar.com

আসছিল যাতে সরকার তাদের নির্দেশ ও নিয়মকানুন অনুসারে চলে। ঘন ঘন ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হবে সরকার সব সময় তাদের কাছে সব কাজে জবাবদিহি করবে। কিন্তু ঐ সময় বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ও উপদলীয় কোন্দলের কারণে যুদ্ধপ্রস্তুতি ব্যাহত হতে পারে মনে করে তাজউদ্দিন সাহেব ও তাঁর সরকার অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। এ সময়ে পার্টিতে কোন্দল খুব গুরুতর আকার ধারণ করে। আজিজ-সেরনিয়াবাত গ্রুপ, মিজান-মোস্তাক গ্রুপ, কামরুজ্জামান-ইউসুফ আলী গ্রুপ প্রভৃতি তাজউদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন সরকার গঠনের জোর তৎপরতা আরম্ভ করে। দলের অখন্ডতা রক্ষার জন্য তাজউদ্দিন সাহেব জুলাইয়ের প্রথম ভাগে শিলিগুড়িতে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ও সংসদ সদস্যদের সভা আহবান করলেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সব সদস্যদের বাগডোগরা পর্যন্ত বিমানে নিয়ে সেখান থেকে গাড়ীতে করে শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে জঙ্গলাকীর্ণ একস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। বাগডোগরা একটি সামরিক বিমানঘাটি। প্লেন নামার সময় বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলে বোপঝাড়ের আড়ালে অসংখ্য সামরিক বিমান রয়েছে দেখতে পেলাম। আমাদের যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে লম্বা কয়েকটি টিনের ব্যারাক দেখতে পেলাম। এখানে ব্যারাকের মধ্যে সারি সারি দড়ির খাটিয়া বিছানো ছিল। তাতেই কম্বল পেতে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হলো।

আমরা পৌঁছার পরদিন একটি সামিয়ানার নীচে সকল সদস্যকে নিয়ে পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং আরম্ভ হলো। একটিং প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব সভাপতিত্ব করছিলেন। মন্ত্রী পরিষদের নেতারা মুজিবনগরে সরকার গঠনের প্রথম থেকে তখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, পরিচালনা, শরণার্থী সমস্যা, যুদ্ধ-জয়ের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতির উপরে বক্তব্য পেশ করলেন। গত তিন-চার মাসে সরকার কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে এবং সে সমস্ত সমস্যা কতটুকু নিরসনে সরকার সক্ষম হয়েছে এ সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সবাইকে ধৈর্য ও সাহসের সংগে সরকারকে

www.pathagar.com

পূর্ণ সমর্থন জানাতে অনুরোধ করলেন। তাজউদ্দিন সাহেব, কামরুজ্জামান সাহেব, প্রফেসর ইউসুফ আলী প্রমুখ বেশ দৃঢ়প্রত্যয়ের সংগে বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত সদস্যদের উৎসাহিত করে তুললেন। সর্বশেষে সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেদিন ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন সেটা মনে রাখবার মত। আমাদের শেষ বিজয় সম্পর্কে অনেকের মনে যেটুকু সন্দেহ ও দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল সৈয়দ নজরুল ইসলামের দীপ্ত ও প্রাণবন্ত বক্তৃতায় তা অনেকটা কেটে গেল। বক্তৃতাশেষে মিটিং ভাঙলে আমি কাছে গিয়ে তাঁর বক্তৃতার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলাম।

মিটিং আরম্ভ হওয়ার প্রথমদিকে কিন্তু উপদলীয় নেতাদের মধ্যে মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুর রব সেরনিয়াবাদ, খুলনার শেখ আঃ আজিজ প্রভৃতির নেতৃত্বে আরও দু'চারজন বিরোধী নেতা সরকার গঠনের পর তিনমাস ব্যাপী যথেষ্ট ব্যর্থতার নজির তুলে ধরে সরকার ও বিশেষভাবে তাজউদ্দিন সাহেবকে আক্রমণ করে জোরালো বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল-- তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে এ সরকার দুর্বল, অপদার্থ। তাজউদ্দিন নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় এ দুর্বল সরকার কোন রাষ্ট্রের নিকট থেকে স্বীকৃতি পাবে না, এছাড়া তিন মাসের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর তেমন কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নিয়মিত বাহিনী গঠনের ব্যাপারেও কোন কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাজউদ্দিন নেতৃত্বে থাকা পর্যন্ত ইন্দিরাবিরোধী ভারতের ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রবাসী সরকারকে কোন সমর্থনই দেবে না। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃত্বে পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। সুখের বিষয় বিরোধী নেতাদের এসব বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতাদের বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। শামসুল হক, আবদুল মান্নান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, আবদুস সামাদ আজাদ প্রমুখ সিনিয়র নেতৃবৃন্দ সরকারের সমর্থনে নতুন সরকারের শক্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যুদ্ধপ্রচেষ্টাতে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধা ও সদস্যদের সুখসুবিধার জন্য কতটুকু বন্দোবস্ত করা

www.pathagar.com

হয়েছে তার বিবরণ দেবার পর উপস্থিত সদস্যরা তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে তাজউদ্দিন সরকারের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন।

শিলিগুড়ির মিটিং-এ শেখ মনি, রব, সিরাজুল আলম খান ছাত্রনেতারা কেউ এল না। দু'একজন নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাও মিটিং-এ যোগ দিতে কলিকাতা থেকে আসল না। গুজব ছড়িয়ে পড়ল তারা মুজিবনগরে রয়ে গেছে ক্যু করার জন্য এবং যেদিন শিলিগুড়িতে মিটিং হচ্ছিল সেইদিনই মুজিবনগরে ক্যু হতে পারে। এই মর্মে জোরালো গুজব ছড়ালেও সৌভাগ্যের বিষয় তেমন কিছু ঘটেনি বা ঘটাবার চেষ্টাও হয়নি।

শিলিগুড়িতে আমরা দুইদিন ছিলাম। আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়েই একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছিল। নদীর মাঝে মাঝে ছোট-বড় পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল। উপরদিক থেকে তীব্রবেগে পানি এসে ঐসব পাথরে ধাক্কা খেয়ে সাদা সাদা ফেনা সৃষ্টি করে নীচের দিকে বয়ে যাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে বহু সদস্য ও সদস্যারাই বিকেল বেলা নদীর কূলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বেড়াতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে কয়েকজন সদস্যা ছিলেন যাদেরকে রীতিমত সুন্দরী বলা চলে। তাদেরকে কেন্দ্র করেই গল্পের আসর প্রধানত জমে উঠছে দেখলাম। সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্কে আমার কিছুটা ভয় ও হীনমন্যতা থাকার ফলে আমি যতদূর সম্ভব এসব দলকে এড়িয়ে চললাম।

প্রথম দিন রাত্রে বেশ কিছুটা ঝড়-বৃষ্টি হলো। তাই পরদিন নদীর ধারে গিয়ে দেখি নদীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। গতকালের শীর্ণ নদী আজ ফুলেফেঁপে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। তীরবেগে উপর থেকে নেমে আসা পানি ডুবন্ত পাথরগুলোতে ধাক্কা খেয়ে বিরাট বিরাট ঘূর্ণির সৃষ্টি করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। যেখানে যেখানে দু'চারটি পাথর খুব বড়, নদীর পানিতে তলিয়ে যায়নি সেখানে প্রচুর ফেনা ও হালকা বাষ্পপুঞ্জের সৃষ্টি হচ্ছে যার উপরে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে একটা মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করছিল। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে নানান কথা

www.pathagar.com

আসছিল। পানি যে গতিতে নীচের দিকে ছুটছিল তাতে মনে হলো এই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেসে থাকতে পারলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পৌঁছে যেতে পারি। এই এলাকা থেকে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা বোধ হয় ১৫/২০ মাইলের বেশী হবে না। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এই পানি হয়তো বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে তিস্তা-যমুনার সঙ্গে মিশছে। তাই অল্প কতক্ষণের মধ্যে এই পানি আমার প্রিয় স্বদেশভূমিকে স্পর্শ করছে একথা ভাবতেই মনটা যেন কেমন হয়ে গেল।

ভোরে নাস্তার পরে ক্যাম্প থেকে উত্তরদিকে নদীর ধার দিয়ে মাইলখানেক এগিয়ে গিয়ে দেখলাম চারদিকে জঙ্গল ঘেরা একটা বেশ বড় ফাঁকা জায়গাতে অনেক লোক জটলা করছে। তার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলাম এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা--কাছাকাছি কোথাও ট্রেনিং ক্যাম্প রয়েছে এবং এই জায়গাতেই তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। একটু পরেই দেখলাম প্রায় দুতিনশ লোক লাইন ধরে বন্দুক কাঁধে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সবার পরনে সামরিক পোশাক নেই। কারও পরনে প্যান্ট, কারও পায়জামা এবং অনেকেরই পরনে বিভিন্ন বর্ণের লুঙ্গি দেখলাম। বুঝতে পারলাম এরা সবেমাত্র ট্রেনিং নিতে আরম্ভ করেছে এবং এদের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক এখনো এসে পৌঁছায়নি। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় সবাই যুবক কিন্তু তাদের মধ্যে বেশকিছু ছেলে দেখলাম যাদের বয়স ১৫/১৬ বছরের নীচে মনে হলো।

দুপুরের একটু আগে আমাদের সদস্যদের মধ্যে জনাপনরকে দেখলাম কার্শিয়াং শহর দেখতে চলেছে। শিলিগুড়ির প্রধান শহর হলো কার্শিয়াং। প্রায় চার হাজার ফুট উপরে একটি সুন্দর শহর বলে শুনেছি। এত কাছে যখন এসেছি তখন শহরটি দেখার আমার খুব ইচ্ছা হওয়ায় তাদের সঙ্গ নিলাম। পদব্রজেই আমরা রওয়ানা হলাম। ঘন্টা দুই যাওয়ার পর দুপুরের দিকে একটা ছোট টিলার উপর দিয়ে আমাদের পথ যাচ্ছে দেখলাম। অন্য সবাই ধীরে ধীরে থেমে থেমে উপরের দিকে উঠছিল। এর আগেও আমি অনেকবার

www.pathagar.com

পাহাড়ে ওঠানামা করেছি এটা দেখবার জন্য ধীরে ধীরে না উঠে খানিকটা পিছনে গিয়ে এক দৌড়ে আমি টিলার উপরে উঠে গেলাম। কিন্তু ওঠার পরেই কি নির্বোধের মত কাজ করেছি এটা বুঝতে পারলাম। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। চোখে চারদিক অন্ধকার দেখলাম এবং সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পৃথিবীতে আলো-বাতাস বলে কিছু নেই। আমি শুয়ে পড়তেই আমার সঙ্গীরা এসে ঘিরে দাঁড়ালো। দু'একজন রুমাল দিয়ে, কেউ কেউ হাতের কাগজ দিয়ে বাতাস করতে লাগল। যাই হোক মিনিট পনের-বিশেক পরে খানিকটা সুস্থ হয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। আমার আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সঙ্গীরা এগিয়ে যাচ্ছে দেখে অপেক্ষা করতে পারলাম না।

ঘন্টাখানিক চলার পর পাহাড়িয়া রাস্তা ছেড়ে এবার একটা পাকা রাস্তায় পড়লাম। এর মধ্যে আমরা প্রায় মাইল সাত-আট এসে গেছি। অনেকে আর অগ্রসর হতে রাজী হলো না। তারা ক্যাম্পের দিকে ফিরে চললো। আমরা চার-পাঁচজন কার্শিয়াং-এর দিকে এগিয়ে চললাম। এখান থেকে কার্শিয়াং আরো পাঁচ-ছয় মাইল পথ হবে, রাস্তা ক্রমে উপরের দিকে যাচ্ছিল বলে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। নিচের দিক থেকে কালো অ্যামবেসেডার ট্যাক্সি প্যাছেঞ্জার নিয়ে উপরের দিকে যাচ্ছিল, আবার উপর দিক থেকে তেমনি অনেক ট্যাক্সি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। পথে লোকজন খুব বেশী দেখলাম না। শুধু মাঝে মাঝে পিঠে বোঝা নিয়ে পাহাড়িয়া মেয়ে-পুরুষ দু'চারজনকে ওঠানামা করতে দেখছিলাম। বিকেল প্রায় ৪টার দিকে আমরা কার্শিয়াং শহরে এসে পৌঁছলাম। এ সময়ে মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল এবং পাতলা পাতলা মেঘপুঞ্জ চারদিক থেকে ভেসে এসে পাহাড়ের গায়ে ঠেকে যাচ্ছিল। উপর থেকে দেখছিলাম যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তার বেশ কয়েক ফুট নীচে পাতলা পাতলা মেঘ ভেসে এসে পাহাড়ের গায়ে লেগে উপরে উঠতে উঠতে শহরে ঢুকে দোকানপাটের ভিতর দিয়ে, রাস্তার অলিগলি পার হয়ে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছিল। এরূপ দৃশ্য আর পূর্বে কখনো

www.pathagar.com

দেখার আমার সৌভাগ্য হয়নি। মনে হচ্ছিল পাতলা মেঘপুঞ্জকে যেন আমরা হাতে ধরতে পারছি। সঙ্গে হাঁড়ি থাকলে তার মধ্যেও যেন ভরে ফেলা সম্ভব হতো। এক চায়ের দোকানে ঢুকে খানিকটা নাস্তা করে শরীরে বল সঞ্চয় করে শহর দেখতে বের হলাম। হাতে সময় আমাদের কম। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল তাই বাজারের ভেতর দিয়ে ঘুরাফেরা করে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার চেষ্টা করলাম। এখানে বাজারে শতকরা নিরানব্বইজনকে দেখলাম নেপালী, ভুটিয়া নারী-পুরুষ। এরাই ক্রেতা ও বিক্রেতা। বিভিন্ন রকমের ফলের দোকান দেখলাম। বেশ কিছু স্টেশনারী দোকানও দেখলাম যেখানে আধুনিক পণ্যসামগ্রী সাজানো রয়েছে। পাহাড়িয়া মেয়েরা যে বিশেষ ধরনের হাড়ের, পিতলের ও নিকেলের অলংকার ব্যবহার করে সেরূপ দোকানও কয়েকটি দেখলাম। দু'চারটি কাপড়ের দোকানও দেখলাম যেগুলিতে বেশীর ভাগ ঝুলানো রয়েছে পাহাড়িয়া মেয়ে-পুরুষের সাজ-পোশাক।

আমাদেরকে বিদেশী মানুষ দেখে দু'পাশের দোকান থেকে দোকানীরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে ডাকাডাকি করতে আরম্ভ করলো। আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে দু'একজন সুভেনার হিসাবে দু'চারটি অল্প দামের জিনিস কেনার পর আমরা বাজার থেকে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে হাজির হলাম। দর কষাকষি করে দেড়শ টাকায় একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে আমরা ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হলাম। ট্যাক্সি যখন নিচের দিকে চলতে আরম্ভ করলো তখন রাস্তার একপাশে খাদের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। রাস্তা খুব চওড়া নয়। যখন আর একটি ট্যাক্সিকে পাশ দেওয়ার জন্য আমাদের ট্যাক্সিটি রাস্তার একেবারে কিনার দিয়ে চলছিল তখন নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল এখনই কয়েক হাজার ফুট নীচে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। অনবরত বুক ধুকধুক করছিল এবং কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। বাম পাশের খাদের দিকে কিছুতেই তাকাতে পারছিলাম না। তাকালেই পেট মোচড় দিয়ে উঠছিল। কিন্তু অবাধ্য চোখকে কিছুতেই অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখতে

www.pathagar.com

পারছিলাম না। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। চোখ বন্ধ করে রাখতে চেয়েও রাখতে পারছিলাম না। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম শিখ ড্রাইভার অবলীলাক্রমে দ্রুতগতিতে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল। তার চোখেমুখে ভয়ের কোন চিহ্নই দেখলাম না। রোজই এরা সারাদিন ধরে কার্শিয়াং শহর থেকে সমতল ভূমিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে, ভেবে বিস্মিত হলাম। শুনলাম মাঝে মাঝে অ্যাকসিডেন্ট যে হয় না এমন নয়। যখন হয় উপর থেকে দু'তিন হাজার ফুট নীচে পড়ে প্যাসেঞ্জার সহ গাড়ীটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। যাই হোক রাত প্রায় ৮টার দিকে আমাদের ট্যাক্সি এসে ক্যাম্পের সামনে থামলো। আমরা ড্রাইভারকে সঠিক ঠিকানা না দিতে পারায় প্রায় আধা ঘন্টা এদিক-ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছলো। এর জন্য ড্রাইভারকে আরো কুড়ি টাকা বেশী দিতে হলো।

পরদিন দুপরে শুনলাম আমাদের বাগডোগরার দিকে রওয়ানা হতে হবে। সবাইকে একসঙ্গে নেওয়া সম্ভব হবে না বলে আমাদেরকে তিন ভাগে নেওয়ার কথা হলো। সেদিন দুপুরের পরে তাজউদ্দিন সাহেব, তাঁর সহকর্মী ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও মহিলা সদস্যাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদেরকে পরের দিন নেওয়া হবে জানতে পারলাম। পরের দিন সকালের দিকে এক গ্রুপকে নেওয়া হলো যাতে আমি স্থান পেলাম না। বিকেলের দিকে শেষ ট্রিপে আমরা প্রায় পঞ্চাশজন রওয়ানা হলাম। সন্ধ্যার একটু আগে বাগডোগরা থেকে প্লেন ছাড়ার আধ ঘন্টা পরেই প্লেনের ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় পথে একটি বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে। কয়েক মাইল দূরে আমাদেরকে একটি ছোট শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। ঐ শহরে তেমন বড় কোন হোটেল না থাকায় ছোট ছোট তিন-চারটি হোটেলে ভাগ করে আমাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হলো। প্রত্যেক কামরায় গাদাগাদি করে পাঁচ-সাতজন করে থাকলাম। হঠাৎ এত অতিথি আসায় হোটেল কর্তৃপক্ষ খুব বিব্রত হয়ে পড়লো। নতুন করে বাজার করে খাবার দিতে রাত প্রায় একটা-দেড়টা বাজলো। রাতের মধ্যেই প্লেনের যান্ত্রিক ত্রুটি সারিয়ে

www.pathagar.com

নেওয়া হয়েছিল। ভোরে নয়টার দিকে রওয়ানা হয়ে বেলা প্রায় একটার দিকে আমরা দমদম এসে নামলাম।

কনসুলেটের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ

জুন-জুলাই পর্যন্ত শেখ সাহেব জীবিত আছেন কিনা সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারছিলাম না। পুরো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল শেখ সাহেবের নামে এবং সমস্ত কর্মকান্ডের উৎসমূল ছিলেন তিনি। তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে না পেরে সবাই ভিতরে ভিতরে হতাশায় ভুগছিল। আগস্টের প্রথম দিকে ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতায় জানা গেল তিনি জীবিত আছেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে তাঁর বিচার হবে। তখন থেকে অধিকাংশ সদস্যই মনেপ্রাণে কামনা করছিল শেখ সাহেবকে মুক্তি দিয়ে ইয়াহিয়া খান আমাদের দাবীদাওয়া মেনে নিয়ে একটা রাজনৈতিক সমাধান করে ফেলুক। এ সময় হঠাৎ একদিন একটি বিভ্রান্তিকর প্রচারণা সদস্য, কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কেন্দ্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল--'স্বাধীনতা, না শেখ মুজিব'। এই প্রচারণার ভিতর দিয়ে প্রকারান্তরে যেন জানতে চাওয়া হচ্ছিল শেখ সাহেবের প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতার দাবী ছেড়ে দিতে রাজী আছি কিনা, অর্থাৎ স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলে শেখ মুজিবকে হারাতে হবে। প্রচারণাটা অত্যন্ত সুকৌশলে মুখে মুখে ও বিভিন্ন স্থানে বিশেষত মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রগুলিতে লিফলেট আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আগস্টের শেষভাগে শুনতে পেলাম গোপনে কোলকাতার আমেরিকার কনসুলেটের সঙ্গে নেতাদের কেউ কেউ আগস্টের প্রথম দিকে যোগাযোগ করেছিল। এই যোগাযোগের মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজি জহিরুল কাইউম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক ও পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষী।

যতদূর জানতে পারা যায় এই যোগাযোগ ভারত সরকারের সম্মতি না নিয়ে অগোচরে করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরে যোগাযোগকারীদের উপর

www.pathagar.com

সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কাজি জহিরুল কাইউম পরে অবশ্য বলেছিলেন তিনি স্বইচ্ছায় বা নিজের দায়িত্বে আমেরিকান কনসুলেটের সংগে যোগাযোগ করেছিলেন শেখ সাহেব জীবিত আছেন কিনা শুধু এটুকু জানার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন শেখ সাহেব তখনও জীবিত আছেন। এ খবর তিনি নাকি তাজউদ্দিন সাহেব, খোন্দকার মোস্তাক ও একটিং প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে জানিয়েছিলেন এবং শেখ সাহেবের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যতদূর মনে হয় কাজি জহিরুল কাইউমের প্রথম যোগাযোগের পরে খোন্দকার মোস্তাক ও মাহবুব আলম চাষী এ কনসুলেটের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ বেশ কয়েকদিন অব্যাহত রাখেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপর যে আলোচনা হওয়ার কথা তাতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি যাওয়ার কথা ছিল এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে খোন্দকার মোস্তাক উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এরমধ্যে ভারত সরকারের হাতে এমন সব গোপন তথ্য এসে পৌঁছালো যাতে ভারত সরকার মনে করলো খোন্দকার মোস্তাকের সংগে কোলকাতার আমেরিকান কনসুলেটের মাধ্যমে করাচীর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফার্লেন্ডের একটা গোপন বোঝাপড়ার চেষ্টা চলছে। ভারত সরকারের ধারণা হলো খোন্দকার মোস্তাক নিউইয়র্ক পৌঁছে হয়তো শেখ সাহেবকে বাদ দিয়েই পাকিস্তান সরকারের সংগে একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে পারে যেটা সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থ ও আদর্শবিরোধী হতে পারে। ভারত সরকারের এ অনুমানের সংগে বাংলাদেশ সরকারও বোধ হয় একমত হয়েছিলেন। ফলে সেপ্টেম্বরের শেষভাগে প্রতিনিধি দলের তালিকা থেকে খোন্দকার মোস্তাকের নাম বাদ পড়ে গেল এবং নভেম্বরের শেষে মাহবুব আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিবের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। এ ব্যাপারটি খোন্দকার মোস্তাকের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক ও কূটনৈতিক পরাজয় বলে ধরা যায়। "স্বাধীনতা না শেখ মুজিব" এই

www.pathagar.com

বিভ্রান্তিকর শ্লোগানও তারই ইঙ্গিতে তাজউদ্দিনবিরোধী উপদলীয় নেতাদের ও সুবিধাবাদীদের সাহায্যে কর্মীদের মনোবল দুর্বল করার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। অধিকাংশেরই ইচ্ছা ছিল--শেখ সাহেবকেও চাই, সেই সঙ্গে দাবী পূরণও চাই। কিন্তু দু'টোর মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়ার প্রচারণার পেছনে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রেরণা ও আয়োজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার একটা সুকৌশল প্রয়াস রয়েছে; সেটা অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠায় প্রচারণাটি আর বিশেষ গতি লাভ করতে পারল না।

সীমান্ত অতিক্রমকারী আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোক ছিল। কারও কারও মনোভাব ছিল যেভাবে হয় একটা শান্তি স্থাপন হয়ে দেশে ফিরতে পারলেই চলে। কিছু লোকের মনোভাব ছিল শেখ সাহেবের মুক্তি ও সম্মানজনক মীমাংসার ভিত্তিতে একটা আশু সমাধান হয়ে যাক যাতে বিদেশের ভূমিতে এই অনিশ্চিত অবস্থা ও টেনশনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরা যায়। এই সম্মানজনক মীমাংসা সম্পর্কেও অনেকের মধ্যে মতের কিছুটা পার্থক্য ছিল। কারও মত ছিল শেখ সাহেবের মুক্তির সংগে পাক সরকারকে পুরো ছয় দফার দাবী অর্থাৎ যেটা কনফেডারেশনের কাছাকাছি তা মেনে নিতে হবে। আবার কারও কারও ইচ্ছা ছিল পূর্ণ ছয় দফা না মানলেও তার মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো মেনে নিয়ে মীমাংসা হয়ে গেলেই চলতে পারে। আর একদল ছিল যাদেরকে মোটামুটি কট্টর বামপন্থী বলা চলে। এদের ইচ্ছা ছিল পানি যখন এতটুকু গড়িয়েছে, এত রক্ত ও প্রাণাহুতি দিতে হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এত যুবক অনুপ্রাণিত হয়ে অস্ত্রশিক্ষার এ সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে তখন দেশকে পরিপূর্ণ স্বাধীন না করে থেমে যাওয়া চলবে না। এই বামপন্থী গ্রুপটি আন্তরিকভাবে স্বাধীন বাংলায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিল। শেখ সাহেবকে মুক্তি দিয়ে অখন্ড পাকিস্তানের মধ্যে কোন রকমের সমঝোতা বা মীমাংসাই এদের কাম্য ছিল না। কিন্তু আমি যতটুকু বুঝতাম একদিকে কোলকাতায় দাঙ্গা আরম্ভের আশংকা, নিজেদের পার্টির মধ্যে দারুণ দলাদলি, ভারতের ডানপন্থী রাজনৈতিক অংশের আমাদের

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধকে সর্বাত্মক সহায়তাদানে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সাফল্যের অনিশ্চয়তা অধিকাংশ সদস্যকে এমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল যে, যে কোনভাবে দেশে ফিরে আসার মতো একটা অবস্থার সৃষ্টি হোক এটা সবাই মনেপ্রাণে আকাঙ্খা করছিল।

আমি স্থিরনিশ্চিত ছিলাম সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এমনকি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শেখ সাহেব মুক্ত হয়ে আমাদের যদি ডাক দিয়ে বলতেন--আমার ছয় দফা দাবী পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছে তাই তোমরা সবাই ঢাকা চলে আস--তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে নিরানব্বই জনই কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পিল পিল করে ঢাকা চলে আসতো। দেশকে পরিপূর্ণ স্বাধীন করবে এরূপ প্রতিজ্ঞা যারা করেছিল মুষ্টিমেয় তারাই হয়তো পিছনে রয়ে যেতো। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের মধ্যেও যারা পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং কট্টর বামপন্থী মতবাদে দীক্ষিত ছিল না তারা পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক এটা মনেপ্রাণে চাইছিল না। পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই একটা আপোস রফা হয়ে যাক এটাই তাদের কাম্য ছিল এবং খোন্দকার মোস্তাক পাকিস্তান টিকিয়ে রেখে যেকোন শর্তে মিটমাটের জন্য বোধ হয় আগ্রহী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের মনোভাব ছিল কোন অবস্থাতেই আমি বিদেশের মাটিতে মরবো না। যদি বুঝতে পারি আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে এবং দেশ তখনো স্বাধীন হয়নি সে অবস্থায় যেভাবে হোক সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের মাটিতে এসে আমি শেষ শয্যা নেব যাতে দেশের মাটিতে আমার কবর হয়।

এপারের ওপারের আমরা

ঐ নয় মাসে সীমান্ত অতিক্রমকারী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অনেককে আমি অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে দেখেছি। আমি বহু জনকে জানি যারা ঢাকা বা বিভিন্ন শহরে প্রচুর সম্পদের মালিক

www.pathagar.com

ছিলেন। অনেকেরই গাড়ী-বাড়ী ছিল। মোটামুটি খুবই সচ্ছল জীবন-যাত্রায় তারা অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কোলকাতা গিয়ে তারা বাংলাদেশ সরকারের সামান্য সাহায্যে কোনভাবে পরিবার নিয়ে ছোট এক কামরা বা দু'কামরায় দিন যাপন করেছিলেন। যাদের আজীবন গাড়ী চড়া অভ্যাস ছিল তাদেরকেও দেখেছি ঠেলাঠেলি করে ট্রামে-বাসে চলাচল করতে। বেলা নয়টা থেকে বারটা, আবার চারটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত কোলকাতায় ট্রামে-বাসে ওঠা যে কি ব্যাপার সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। আমাদের জেলার রামগঞ্জের এম, এন, এ রশিদ সাহেব বেশ অবস্থাসম্পন্ন লোক। তাকেও দেখেছি ডিক্রুন লেনে পরিবারের পাঁচ-সাতজনকে নিয়ে ছোট দু'টি কামরায় কাল কাটাতে। তার একমাত্র বার বছরের কন্যা তখন ক্যান্সার হয়ে ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। ডিক্রুন লেন থেকে ভবানীপুর প্রায় আট-দশ মাইল। ঐ পথটি তাকে প্রত্যহ বিকেলে মেয়েকে দেখার জন্য বাদুরবোলা হয়ে বাসে বা ট্রামে যেতে হতো। আমি পার্ক সার্কাস থাকতাম বলে কোনাকোনি মাইল চারেক পথ পায়ে হেঁটে মেয়েটিকে দেখতে যেতাম। মেয়েটি আমার ভাগ্নী হতো বলে ক্যান্সারের ব্যথায় যন্ত্রণায় কাতর মেয়েটিকে দেখতে যাওয়ার একটা মানসিক তাগিদ আমি প্রায়ই বোধ করতাম। তদানীন্তন নোয়াখালী জেলার জাতীয় পরিষদ সদস্য মালেক উকিল ও নুরুল হক মিয়া এরাও খুব অবস্থাপন্ন মানুষ ছিলেন। প্রত্যেকের নিজের এলাকায় বেশ বড় পাকা বাড়ী ছিল। মালেক সাহেবের পরিবার কোলকাতায় এবং নুরুল হক মিয়ার পরিবার উদয়পুরে সে সময়ে অত্যন্ত কষ্ট করে দিন কাটিয়েছে।

ঐ সময়ের প্রসিদ্ধ ইনকাম-ট্যাক্স আইনজীবী আশ্রাফ আলী চৌধুরীকেও দেখেছি কংগ্রেস এক্সিবিশন রোডের দোতলায় একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করতে। আশ্রাফ আলী চৌধুরীর তখনো মাসিক আয় ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা, অর্থাৎ আজকের তুলনায় দশ-পনর লক্ষ টাকা। অত বড় আয়ের মানুষ যে আরামের জীবনে

www.pathagar.com

অভ্যস্ত ছিলেন তিনিও দেশের মুক্তির জন্য প্রবাসে হাসিমুখে কষ্ট স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। ফরিদপুরের এম, পি আবুল খায়ের যিনি মগবাজারে একটি চারতলা বাড়ীর মালিক ছিলেন তিনিও পাক সার্কাসে ছোট একটি দু'কামরার বাড়ীতে পরিবার নিয়ে বাস করতেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক গাফ্ফার চৌধুরীও ডিক্সন লেনে রশিদ সাহেব যে ফ্লাটে থাকতেন তারই এক কামরায় স্ত্রী ও চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্টে দিন যাপন করেছিলেন। আমি যে বাসায় থাকতাম সেখানে স্ত্রী, এক কন্যা ও এক ছেলে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী শওকত ওসমান। তিন তলার একটি মাত্র কামরায় তাঁরা থাকতেন এবং দুইহাত চওড়া একফালি বারান্দায় অতিকষ্টে রান্নার কাজ সমাধা করতেন। বাড়ীটিতে নিচতলায় একটি কল থাকলেও উপর তলায় পানি সরবরাহের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। বাইরে থেকে লোক দিয়ে পানি আনাতে হতো। ঢাকায় কিন্তু রাজারবাগের পুলিশ লাইনের উল্টোদিকে তাঁর একতলা নিজের বাড়ী ছিল এবং মোটামুটি সচ্ছলভাবেই জীবন-যাপন করছিলেন। আরও বহু লোকের অবস্থা এরকমই ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য এরা নিজেরাই যে শুধু ওসব ঘরে থাকতেন এমন নয়। সীমান্ত অতিক্রমকারী আত্মীয়-স্বজন, মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে ইচ্ছুক নিজের এলাকার যুবকদের মধ্যেও কেউ এসে পড়লে অন্যত্র বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকেও দু'চার দিনের জন্য নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিতে হতো। আরও কত লোক যে কতভাবে কষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমার নিজেরও তখন ঢাকায় দু'তিনখানা গাড়ী ছিল কিন্তু আমি ঠেলাঠেলি করে ট্রামে-বাসে চলাচল করার চেয়ে পায়ে হেঁটে চলাচল করতেই বেশী পছন্দ করতাম। দুপুরে যখন কিছুটা ফাঁকা থাকতো তখন ছাড়া পারত-পক্ষে আমি ট্রামে-বাসে উঠতাম না। প্রথম প্রথম হাঁটতে একটু কষ্ট হলেও পরে সাত-আট মাস আমি দৈনিক আট-দশ মাইল অনায়াসে হেঁটে বেড়িয়েছি, কোন কষ্টই অনুভব করিনি। ঢাকার জীবনের সঙ্গে এই জীবনের পার্থক্যের কথা মনে যখন আসতো তখনই শরণার্থী শিবিরের উদ্ভ্রান্তদের কথা, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের ঝোপ-ঝাড়ে মশা,

www.pathagar.com

সাপ, বিচ্ছুদের মাঝে রাত্রিযাপনের কথা মনে পড়তেই ভাবতাম স্বর্গসুখে আছি। কোন কষ্টই আর মনে আসতো না।

যে বাসায় আমি থাকতাম সেখানে যেহেতু আমার থাকা-খাওয়ার খরচ লাগতো না তাই বাংলাদেশ সরকার থেকে যে চারশ টাকা মাসোহারা পেতাম তার প্রায় সবটাই বেঁচে যেত। আগরতলায় আমাদের নোয়াখালী জেলার অনেক যুবকই এসে হাজির হয়েছিল। শরণার্থী শিবিরে অতিকষ্টে দিন কাটাতো। অনেকে আবার শরণার্থী শিবিরে স্থান না পাওয়ায় এখানে-ওখানে মাথা গুঁজে এর-ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ধার-হাওলাত করে দিন কাটাচ্ছিল। রশিদ সাহেব মাঝে মাঝে আগরতলা ও উদয়পুরের রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য কোলকাতা থেকে যেতেন। থাকা-খাওয়া ও যাতায়াত খরচ আমার প্রায় লাগতো না বলে উদ্‌বৃত্ত সমস্ত অর্থই আমি ছিন্নমূল ঐ সমস্ত যুবকদের দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রায়ই রশিদ সাহেবের হাতে তুলে দিতাম এবং তিনি সেগুলি রীতিমত বিতরণ করে আসতেন। কোলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের জন্য বাড়ী যোগাড় করার ব্যাপারে ষাটের দশকে ঢাকায় প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তৎকালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রকাশক ও ছাপাখানার মালিক শ্রী বারীন মিত্র আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

কোলকাতায় আশ্রয় গ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে সবাই যে মনে-প্রাণে মুক্তিযুদ্ধের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এমন নয়। নেতৃস্থানীয় নেতাদের মধ্যে তখন মন্ত্রী ছিলেন না পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন এরূপ কেউ কেউ এমন ধরনের জীবন যাপন আরম্ভ করেছিলেন যেটা কোলকাতার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ সমালোচনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাউকে কাউকে নাকি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পুলিশ নিষিদ্ধ পল্লী বা ড্রেন থেকে তুলে মাঝে-মধ্যে বাসায় পৌঁছে দিয়েছে বলেও শোনা যেত। তবে এদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

মুজিবনগরে যখন আমরা এরূপ কষ্টকর জীবন কাটাচ্ছি তখন সীমান্তের এপারে অনেকেরই ধারণা ছিল তারাই শুধু হানাদার

www.pathagar.com

বাহিনীর আক্রমণের আতঙ্কে এখানে মর্মান্তিক দুঃখের জীবন কাটাচ্ছিল। আসলে কষ্ট উভয়স্থলের লোকেরাই করছিল। অবশ্য স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে এসে এখানকার মানুষ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যেভাবে প্রাণের ভয়ে নিদ্রাহীন আতঙ্কিত জীবন যাপন করতো, গ্রামের লোক রাতে জীপের আওয়াজ শোনা মাত্র যুবতী মেয়েদের ইজ্জত ও প্রাণহানির ভয়ে পাটক্ষেতে ঢুকে বেতপাতার মত কাঁপতে থাকতো, আর্মি আসছে শুনে বাড়া ভাত ফেলে পোটলাপুটলি নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করতো––এসব বিভীষিকাময় কাহিনী শোনার পর মনে হলো আমরা মুজিবনগরে যত কষ্টই করি না কেন দেশের মধ্যে মানুষ যে কষ্ট করেছে তার সঙ্গে আমাদের কষ্টের তুলনাই হয় না। আমরা হয়ত খাওয়ার কষ্ট করেছি, সুখে ঘুমাতে পারিনি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভেবে মনে শান্তি পাইনি কিন্তু রাতে আমাদের শান্তিতে ঘুমাতে অসুবিধা হয়নি, মৃত্যুভয়ে প্রতি মুহূর্তে বেতসপত্রের মত আমাদের কম্পিত হতে হয়নি। তাই এখানের মানুষ আমাদের চাইতে যে অনেক বেশী কষ্ট করেছে, স্বাধীনতার বেদীতে আমাদের চাইতে অনেক বেশী অবদান রেখেছে এতে কোন সন্দেহ নাই।

স্বাধীনতার চেতনা লুপ্তির কারণ

কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে ফিরে আসার পর আওয়ামী লীগের অনেক কর্মীকেই দেখেছি স্বাধীনতার সকল কৃতিত্ব যেন তাদের প্রাপ্য এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলো। যারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে তারাই সত্যিকার দেশপ্রেমিক আর যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল তারা যেন সব রাজাকার––এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে গিয়ে আমার এলাকায় বহু আওয়ামী লীগ কর্মীকে ভীষণ সমস্যা সৃষ্টি করতে দেখেছি। এত কষ্ট সহ্য করার পরও তার স্বীকৃতি না পেয়ে, তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও অপমানকর ব্যবহার পেয়ে অনেক দেশপ্রেমিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আমি মর্মাহত হতে দেখেছি। সীমান্ত অতিক্রমকারী মাত্রই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিক বা না দিক শরণার্থী শিবিরে বসে বসে দিন কাটালেও

www.pathagar.com

প্রত্যেকেই প্রায় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা মনে করত এবং দেশে ফিরে এসে অনেকেই এরূপ আচরণ করতে আরম্ভ করল। অনেক কষ্টে তাদের বুঝাতে হলো যে, কোন সময়ই দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে যুদ্ধের সময় দেশ ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। অনেকে অনেক বাস্তব কারণে যেতে পারে না। আর সবাই যদি দেশ ত্যাগ করে তো মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় পাবে কোথায়? আমার মনে হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরেই মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত-বিরোধী একটা মনোভাব ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশের পিছনে ঐসব তথাকথিত ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের আচরণ অনেকখানি কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী জামাত, আলবদর, আলসামস-এর লোকেরা আমাদের অর্বাচীন কিছু যুবকের এই ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর আচরণের সুযোগ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী বহু মর্মাহত ব্যক্তিকে আমাদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন করে তুলবার সুযোগ পেয়েছিল।

এত কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতার চেতনা মানুষ এত অল্প সময়ে হারিয়ে ফেললো কেন, এ কথাটা আমি পরবর্তীকালে অনেক ভেবেছি। ২৫শে মার্চের পরে দেশের সাধারণ মানুষ একে অন্যকে ভাইয়ের মত আলিঙ্গন করেছে, নিজে না খেয়েও অপরকে খাইয়েছে, পথে পথে লঙ্গরখানা খুলে শহরত্যাগী অসহায় মানুষগুলোকে খাবার যুগিয়েছে, শত বিপদ ঘাড়ে নিয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে--তারা হঠাৎ এত অল্প সময়ে স্বাধীনতার মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেললো কিভাবে? আমার মনে হয় এর তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত যেসব যুবক সীমান্ত অতিক্রম করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে আদর্শহীন। এদের অধিকাংশই এলাকায় মস্তানী করে বেড়াতো, নিউমার্কেটের সামনে বা বিভিন্ন মেয়েস্কুলের প্রবেশদ্বারে এরা শিস্ দিয়ে বেড়াতো। পাক সেনারা যুবক দেখলেই ধরে নিয়ে যায় শুনে এরা সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন যুব ক্যাম্পে হাজির হয়। এদের প্রথম কিছুদিন মটিভেশন দিয়ে তারপর মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি করে পরে যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া হতো। এখন যুদ্ধ নয় মাসে শেষ হয়ে যাওয়ায় এদের অধিকাংশই যুদ্ধে ট্রেনিং পাওয়া তো দূরের কথা

www.pathagar.com

মটিভেশন গ্রহণেরও কোন সুযোগ পায়নি। তাই এদের চরিত্রের কোন পরিবর্তনেরই সুযোগ ঘটেনি। মাবখান থেকে মুক্তিযোদ্ধা নামে একটি ভুয়া সম্মানজনক পদবীর অধিকারী হয়ে দেশে এসে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার মওকা পেয়ে গেল। এদের আচরণে সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিও লোকের মন বিগড়ে যেতে লাগল এবং জামাত, মুসলিম লীগ প্রভৃতি স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের গুপ্ত প্রচারণায় সাধারণ লোকেরা স্বাধীনতার চেতনা হারিয়ে ফেলতে লাগল।

দ্বিতীয় কারণ হলো, শেখ সাহেবের ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই উপরোক্ত ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ও তার পার্টির কিছু কিছু কর্মীদের লুটপাট বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগ হওয়া। নিজে অত্যন্ত সৎ সাহসী পুরুষ হলেও কর্মীদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-মমতাবশত তিনি প্রয়োজনানুরূপ কঠোর হতে না পারায় লুণ্ঠন, দুর্নীতি, অরাজকতা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে লোকের মনোবল ভেঙ্গে গিয়ে স্বাধীনতার চেতনা লুপ্ত হয়ে যেতে লাগলো। টাকার মূল্য দ্রুত কমে গিয়ে জিনিসের দাম অসম্ভব বেড়ে যেতে লাগলো। স্বাধীনতার পূর্বে ছয় আনার গামছা দেখতে দেখতে ছয় টাকা হয়ে গেল, দশ-বারো টাকার একটি শাড়ীর দাম চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা হয়ে গেল। দুই টাকার একটি লুঙ্গির দাম সতর-আঠারো টাকা হয়ে গেল, চার আনা সেরের ইউরিয়া সার চার টাকা হয়ে গেল। লোকে ভাবলো, এ কি রকমের স্বাধীনতা পেলাম? ফলে ভিতরে ভিতরে অনেক লোক স্বাধীনতার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

তৃতীয় কারণ হলো শেখ সাহেব ও তাজউদ্দিন সাহেবের মধ্যে মতবিরোধ। এই মতবিরোধ যে দেশের পক্ষে কতখানি ক্ষতির কারণ হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। যুদ্ধের পরে পরেই যখন বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলার জন্য দেশের মানুষের ও সরকারী দলের নেতাদের মধ্যে মতের অটুট ঐক্যের প্রয়োজন ছিল ঠিক তখনই জাতির পিতা শেখ মুজিব ও স্বাধীনতার স্থপতি তাজউদ্দিনের মধ্যে

www.pathagar.com

গভীর মতবিরোধ দেশের স্বার্থের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়েছিল। এতে আওয়ামী লীগ পার্টি ভিতরে ভিতরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, নেতাদের মতপার্থক্যের কারণে বুরোক্রেসী ক্ষমতাধর হয়ে উঠছিল, পার্টির কর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দেওয়ার ফলে দুর্নীতির সর্বগ্রাসী বিস্তার প্রশাসনযন্ত্রকে প্রায় বিকল করে তুলেছিল।

এ মতবিরোধের জন্য কে প্রধানত দায়ী সেটা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। তবে আমি যতটুকু অনুমান করতে পেরেছি তাজউদ্দিন কর্তৃক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন করে দেশ স্বাধীন করাকে শেখ সাহেব মনেপ্রাণে সন্তুষ্টির সংগে গ্রহণ করতে পারেননি। এটাকে তিনি তাজউদ্দিনের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব মনে করে বোধ হয় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তার ধারণা ছিল পঁচিশে মার্চ রাতে পাক বাহিনী যে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল কিছু ছাত্র-জনতা হত্যার মারফৎ সাময়িকভাবে হলেও তারা অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু এক বছর কি দেড় বছর পরে হলেও জাগ্রত জনতার আন্দোলনের সামনে নতি স্বীকার করে তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না করে পারবে না। কিন্তু তার সে হিসাবকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাজউদ্দিন যে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশ স্বাধীন করে ফেলতে পারবে এটা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। তাই এটা যখন বাস্তবে ঘটলো তখন তাজউদ্দিনের প্রতি একটা প্রচন্ড অভিমান বা বিতৃষ্ণা তিনি মনে পোষণ করতে আরম্ভ করলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার গ্রেফতার হওয়ার পরে দেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছিল, কিভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া হয়েছিল, সে সময় কে কি ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিল, কার অবদান কতটুকু ছিল এ সম্পর্কে তিনি কোনদিন কোন খবরই জানতে চাননি। এ ব্যাপারে কখনো কোন আলোচনাও হতে দেননি। বাহাত্তরের দশই জানুয়ারী থেকে পঁচাত্তরের পনরই আগস্ট পর্যন্ত রেডিও-টেলিভিশন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে বাহাত্তরের নয়ই জানুয়ারী পর্যন্ত এ সময়টুকু সম্পর্কে সর্বপ্রকার নিরবতা পালন করা হয়ে আসছিল, কারণ ঐ সময় তিনি

www.pathagar.com

ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং আলোচনা হতে গেলেই তাজউদ্দিনের নাম মধ্যমণি হিসাবে এসে পড়ে যেটা তিনি সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। স্বাধীনতা অন্যের হাত দিয়ে আসবে সেটা তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না।

তাঁর এই মনোভাব আর একটা ব্যাপার থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর '৭৫ সনে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত সতরই এপ্রিল, যেদিন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কুষ্টিয়ার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করেছিল, সে তারিখটি চারবার এসেছিল। এদিনটি স্বাধীন বাংলার মানুষ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছে খুবই পবিত্র দিন বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু শেখ সাহেবের জীবিতকালে ঐ স্থানে তিনি নিজে তো কোন বছরই যাননি এমনকি পার্টির কাউকে যেতেও দেননি। ঐ দিনকে স্মরণ করে কোন আলোচনা অনুষ্ঠানও হতে দেননি। ফলে শেখ সাহেবের এরূপ আচরণে তাজউদ্দিন সাহেব মনে দারুণ আঘাত পান। তার মনের ক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রচন্ড আকার ধারণ করে। তিনি দুঃখ করে অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবকে বলেছেন, শেখ সাহেব যদি একদিন ডেকে সবাইর সামনে জিজ্ঞেস করতেন "বল তো তাজউদ্দিন আমি চলে যাওয়ার পর তোরা কিভাবে দেশ স্বাধীন করলি? কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ করলি?" তা হলেই আমি মনে করতাম এই নয়মাস ধরে যে কষ্ট স্বীকার করেছি তার পুরস্কার পেয়ে গেছি। জাতির পিতার স্বীকৃতি ও অভিনন্দনই আমার মনপ্রাণকে তৃপ্ত করে দিত। তা না করে আমার কৃতিত্বকে তিনি তার ব্যর্থতা মনে করে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে আমাকে রাজনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। একদিন জানতে চাইলেন না তার অবর্তমানে আমরা কে কি করেছি, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে?

তাজউদ্দিন সাহেবের মনে যদি এ ক্ষোভ জন্মে থাকে তবে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রম করে যে বিজয় তিনি অর্জন করেছেন এবং এ বিজয় অর্জন করতে গিয়ে বিপরীত শক্তিসমূহের

www.pathagar.com

সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে তাকে যেভাবে প্রতিনিয়ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তার জন্য লীডারের কাছ থেকে ধন্যবাদ বা প্রশংসাপ্রাপ্তির বদলে যখন তিরস্কার ও প্রতিহিংসা জোটে তখন রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে বিদ্রোহ না করে পারা যায় না। প্রথমে বিস্ময়, পরে হতবাক, পরিশেষে ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি পারলেন না। এর ফলাফল শেষ পর্যন্ত পার্টি ও দেশের জন্য মারাত্মক হয়েছিল। তাজউদ্দিন সাহেবের মতো সৎ, জ্ঞানী ও শেখ সাহেবের প্রতি বিশ্বস্ত সহকর্মী আর পার্টিতে দ্বিতীয় লোক ছিল কিনা সন্দেহ। তাকে শেখ সাহেবের ডান হাত বলা হতো। এ ডান হাত নিজের হাতে ভেঙ্গে শেখ সাহেব নিজেই নিজেকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। তাজউদ্দিন সাহেবের প্রতি শেখ সাহেবের হঠাৎ এ মনোভাব হওয়ার পেছনে অনেকেই মনে করেন শেখ ফজলুল হক মনির প্ররোচনা ছিল। শেখ মনি ছিল অত্যন্ত ধূর্ত, বুদ্ধিমান, উচ্চাভিলাষী। শেখ সাহেবের চাইতে লেখাপড়াও সে অনেক ভাল জানতো। শেখ সাহেবের চরিত্রে কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে সেটা সে ভালভাবেই অবগত ছিল। তাই সে জানতো যে শেখ সাহেব বেশী দিন দেশ চালাতে পারবেন না। আজ হোক কাল হোক তাঁকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। তখন সে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করবে। কিন্তু তাজউদ্দিন সাহেব থাকা পর্যন্ত সেটা সম্ভব নয়। তাই শেখ সাহেবকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে প্রথমে তাজউদ্দিনকে ধ্বংস করতে হবে, কারণ শেখ সাহেবের পরে তাজউদ্দিনই হলো আওয়ামী লীগে দ্বিতীয় শক্তিধর ব্যক্তি। তাজউদ্দিনকে ধ্বংস করতে পারলে শেখ সাহেবকে ক্ষমতাচ্যুত করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে তার আর বেশী অসুবিধা হবে না। তাই সে শেখ সাহেবকে প্রথম থেকে বুঝাতে লাগল--মামা, যে ব্যক্তি আপনার অবর্তমানে দেশ স্বাধীন করতে পারে সে বড় সোজা পাত্র নয়। একদিন এই লোকই আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস করে ফেলুন। এসব মন্ত্রণা কয়েকদিন ধরে শেখ সাহেবের কানে দেওয়াতে সম্ভবত কথাটি তাঁর মনে লেগে যায় এবং মামা ও ভাগ্নে মিলে তাজউদ্দিন কোলকাতায় বিভিন্ন ব্যাংকে অনেক টাকা রেখে

www.pathagar.com

এসেছে, সে-ই ম্যান সেরু মিয়া, ভারতের সঙ্গে তাজউদ্দিন গোপন চুক্তি করে দেশকে বেঁচে দিয়ে এসেছে--বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্যে বিশেষত বাংলার বাণী ও বিচিত্রার মারফৎ এসব কথা ছড়িয়ে তাজউদ্দিনকে ভারতের দালাল প্রতিপন্ন করে তার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নষ্ট করতে আরম্ভ করলো। শেখ মনির যে শেখ সাহেবকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বাসনা ছিল সেটা বুঝা যায় চুয়াত্তর সনের প্রথমে শেখ সাহেবের মস্কো থেকে ফেরার পর যুবলীগের কিছু অংশ থেকে ঢাকা বিমান বন্দরে শ্লোগান উঠেছিল "শেখ মুজিব না শেখ মনি--শেখ মুজিব না শেখ মনি"। এ শ্লোগান থেকে শেখ মনির ভবিষ্যৎ চিন্তাধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে প্রায় এক লক্ষ যুবকের হাতে অস্ত্র চলে গিয়েছিল যেটা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্বাধীন বাংলার সামাজিক নিরাপত্তার জন্য একটা দারুণ হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকার একমত হয়েছিল যে দেশ স্বাধীনের পর এই যুবকেরা প্রায় সবাই যখন বেকার হয়ে পড়বে তখন স্বাভাবিক আয়ের কোন পথ খুঁজে না পেয়ে লুটপাটের জন্য ঐ অস্ত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করবে। এ সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার জন্য সমগ্র মুক্তিবাহিনীর লোকদের নিয়ে একটি ন্যাশনাল মিলিশিয়া গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঠিক করা হয়েছিল যে এই সমস্ত যুবকদের এক জায়গায় আটকিয়ে রেখে তাদের থেকে সমস্ত অস্ত্র নিয়ে নেওয়া হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে তাদের কিছু অংশ প্রশাসনে, কিছু পুলিশ ও আনসারে, বাকীদেরকে বিভিন্ন ছোটখাট চাকরিতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যারা লেখাপড়া করতে চাইবে তাদেরকে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে। মোটামুটি এই প্রোগ্রামের ভিত্তিতে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্যা সমাধানের কথা ভারত ও বাংলাদেশ সরকার চিন্তা করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত শেখ মনি তার মামাকে বুঝাল-- যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শেখ সাহেব অনুপস্থিত ছিলেন এবং অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই তাজউদ্দিন সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিল, তাই পরবর্তীকালে যখন তাজউদ্দিন সাহেব ও শেখ

www.pathagar.com

সাহেবের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হবে তখন অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই তাজউদ্দিনকে সমর্থন করবে। এ অবস্থায় জাতীয় মিলিশিয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে দেওয়াই ভাল। তাজউদ্দিন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়েছিল জাতীয় মিলিশিয়ার যুবকদের যতদিন পর্যন্ত কোন কাজ দেওয়া না যাবে ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট মাসোহারা দেওয়া হবে। এতে মাসে আনুমানিক ছয় কোটি টাকা করে বছরে ষাট-সত্তর কোটি টাকা খরচ হবে অনুমান করা হয়েছিল। সমগ্র দেশের নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে এই খরচ একটা বড় খরচ বলে তখন মনে করা হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শেখ মনির পরামর্শে মিলিশিয়া বাতিল করে শেখ সাহেব অস্ত্রধারী এতবড় একটা যুবক গোষ্ঠীকে যখন বেকার করে দিলেন তখন এই যুবকেরা সবাই অস্ত্র হাতে জীবিকা অর্জনের জন্য লুটপাটে নেমে পড়লো। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাও আর তৈরী হলো না, আসল মুক্তিযোদ্ধা আর ভুয়া ১৬তম ডিভিশন সব একাকার হয়ে গেল। সর্বত্র লুটপাট আরম্ভ হয়ে জনজীবন কিরূপ ত্রাসের সম্মুখীন হয়েছিল সে স্মৃতি এখনও অনেকেরই মনে নিশ্চয়ই জাগরুক আছে। তাজউদ্দিন সাহেবের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে তখন দেখা গেছে দেশের মঙ্গলের জন্য তাজউদ্দিন সাহেব যে ব্যবস্থাই নিতেন শেখ সাহেব তার উল্টো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এত কষ্টোপার্জিত, এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল্যবোধের চেতনা এভাবেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারী সামরিক সরকার আগমনের পথ তৈরী হয়েছিল।

শেখ সাহেবের মধ্যে এমন কতকগুলি আশ্চর্যজনক গুণ ও দোষের সমাবেশ আমি দেখেছি যেটা আমাকে সত্যিই বিস্মিত করেছিল। তাঁর মতো সাহসী পুরুষ আমার জীবনে আমি কম দেখেছি। আটান্ন সালে মার্শাল-ল জারীর পরে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতাসহ পাঁচ-ছয়টি গুরুতর অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা হয়। আইউব খানের মার্শাল-লই ছিল পাকিস্তানের প্রথম মার্শাল-ল যাতে মানুষ তখন কি পরিমাণ আতংকিত হয়েছিল সেটা আজকে কল্পনা করা বেশ কষ্টকর। ঐ সময় যখন পাঁচটি

www.pathagar.com

মোকদ্দমা মাথার উপরে ঝুলছে তেজগাঁও এয়ারপোর্টে একদিন শেখ সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমি তাঁর শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করে কথায় কথায় বললাম আপনার বিরুদ্ধে মার্শাল-ল'তে পাঁচটি মোকদ্দমা নাকি রুজু করা হয়েছে? শুনে তিনি অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, তাতে কি হয়েছে? একথা বলার সময় আমি লক্ষ্য করলাম তার মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্রও নেই। দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাধারণত একটা ফৌজদারি মোকদ্দমার আসামী হলে আমরা দেখেছি হাঁটতে গেলে ভয়ে হাঁটু ভেঙ্গে আসে। মোকদ্দমার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে গলা শুকিয়ে যায়। আর এ ক্ষেত্রে পাঁচটি সামরিক আইনের আসামী হয়েও লোকটির মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচলতা দেখলাম না।

আটান্ন সালে মার্শাল-ল জারীর পরে আইয়ুব খান যখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন তখন লক্ষাধিক মানুষ তাকে ঢাকা স্টেডিয়ামে অভিনন্দন জানায়। প্রথম তিন-চার বছর তার জনপ্রিয়তা বিশেষ ক্ষুণ্ন হয়নি। এ অবস্থায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে বাষটি/তেষট্টি সনের দিকে আইয়ুব খানের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা তখন যেমন-তেমন সাহসের কাজ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে বোধ হয় শেখ সাহেবই তার ক্ষমতাকে পল্টন মাঠে প্রথম চ্যালেঞ্জ করেন। সে সময় অবস্থা এমনই ছিল শেখকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ভূমিকা ত্যাগ করাবার জন্য যত কোটি টাকা লাগত, যত বড় সম্মানই দেওয়ার প্রয়োজন হতো আইয়ুব খান কোন কিছু দিতে কার্পণ্য করতেন না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব বা দুই-চারটি জুট মিলের মালিকানা দিয়েও শেখ সাহেবকে খুশী করা যদি সম্ভব হতো আইয়ুব খান তা করতেও দ্বিধা করতেন না, কিন্তু সাচ্চা দেশপ্রেমিক ও বাংলাদেশের মানুষকে তিনি মনেপ্রাণে ভালবাসতেন বলে কোনকিছুর বিনিময়েও তিনি আত্মবিক্রি করতে রাজী হননি।

ইয়াহিয়া খানের সময় যখন ঢাকায় আলোচনা চলছিল তখন একদিন রহস্য করে আমি তাজউদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম--লেখাপড়ায়, জ্ঞানে-গরিমাতে আপনারা অনেকেই শেখ

www.pathagar.com

সাহেবের চাইতে বড়, তথাপি এ লোকটির কথায় আপনারা এভাবে ওঠেন-বসেন কেন? তখন তাজউদ্দিন সাহেব হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, তার কারণ শেখ সাহেবের মতো সাহস আমাদের কারো নেই। ইয়াহিয়া খান যখন আলোচনার সময় টেবিলে এক থাপ্পড় দিয়ে কথা বলেন তখন দুই থাপ্পড় দিয়ে কথা শেখ সাহেব ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ বলতে পারে না। সাতই মার্চের কয়েকদিন আগে টিক্কা খান ঢাকায় আসার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। পাঞ্জাবে শিয়া-সুন্নী রায়টে তার নৃশংসতার কথা অনেকেরই জানা ছিল। আমাদের অনেকেরই বুকে কিছুটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু সাত তারিখে রেসকোর্স ময়দানে শেখ সাহেবের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের পর যাদুমন্ত্র বলে সে ভয় কোথায় উড়ে গেল বলতে পারি না। তাঁর সেদিনকার সিংহগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শ্রোতারা ভয়ডরহীন অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

শেখ সাহেবের আহ্বানে সমগ্র দেশের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাঁর আহ্বানে অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা মতভেদ ভুলে গিয়ে আওয়ামী লীগের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর নামেই সমগ্র যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর নাম ছাড়া একাত্তরের যুদ্ধে জয়লাভ করা যেত না। আর তিনি ফিরে না এলে বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারীতে ভারতীয় বাহিনী দেশে ফিরে যেত না এটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। তাঁর অবর্তমানে বাহাত্তরের প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে এমন সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে যেত যে ইচ্ছা সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনীর এদেশ ত্যাগ করা সম্ভব হতো না। ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান এদেশে বিলম্বিত হলে যে কি পরিমাণ রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিত তা এই মুহূর্তে কল্পনা করা যায় না। তাই অন্যান্য কথা বাদ দিলেও শুধু স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এবং ভারতীয় বাহিনীর অপসারণ এই দুইটি অমূল্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের মানুষ শেখ সাহেবের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। শেখ সাহেবের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কোন মানুষকে বা কর্মীকে বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বেও তিনি কোথাও দেখলে তার নাম তিনি সঠিক মনে রাখতে পারতেন।

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও ফজলুল হক সাহেব তাঁরাও এরূপ অসামান্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। এ গুণ শুধু ক্ষণজন্মা মানুষের মধ্যেই থাকে। শেখ সাহেবের এতসব অসামান্য গুণের মধ্যে আমি দু'একটি দোষও দেখেছি যেটা দেশ ও জাতির জন্য অতীব ক্ষতির কারণ হয়েছিল। তিনি নিজে ছাড়া অন্যের প্রশংসা ভালভাবে নিতে পারতেন না। এটাকে এক ধরনের মানসিক সংকীর্ণতা ছাড়া আর কি বলা যায়? তাঁর অবর্তমানে তাজউদ্দিন সাহেবের দেশ স্বাধীন করার কৃতিত্বটা তিনি সহজে নিতে পারলেন না।

আমার জেলার একজন এম,পি'র কথা জানি যিনি প্রচুর অর্থব্যয় করে পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট প্রভৃতি ছেপে দিয়ে শেখ সাহেবের অশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন। বাহাত্তরের মাঝামাঝি একদিন শেখ সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার নির্বাচনী এলাকার খবর কি? এম, পি ভদ্রলোকটির দেশের সংগে সত্তরের নির্বাচনের পূর্বে বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। শেখ সাহেবের নমিনেশনের গুণেই তিনি নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন এবং খুব আত্মসম্মানী লোক বলে ভবিষ্যতে যাতে অপরের নাম বেচে নির্বাচন করতে না হয় সে উদ্দেশ্যে মনপ্রাণ দিয়ে নিজের এলাকায় কাজ করছিলেন এবং অল্প কিছুদিনে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। শেখ সাহেব প্রশ্ন করায় তিনি ফস্ করে উত্তর দিলেন--মুজিব ভাই, দোয়া করুন আর ছয় মাস যদি সময় পাই তবে ভবিষ্যতে আর কারো তাবিজের দরকার হবে না। বলা মাত্র ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন শেখ সাহেবের হাসিমুখ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। ভদ্রলোক ভেবেছিলেন শুনে শেখ সাহেব খুশী হবেন এবং এগিয়ে এসে পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বলবেন--বাঃ, এইতো চাই। অপরের হাত ধরে হাঁটার চাইতে নিজের পায়ে হাঁটতে পারাই ভাল। যা হোক ভদ্রলোক বিমর্ষচিত্তে বিকেল বেলা তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় এসে ঘটনাটা বলে শেখ সাহেবের এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি জানতে চাইলেন। তাজউদ্দিন সাহেব বললেন--আপনি সর্বনাশ করেছেন, ভবিষ্যতে আপনার আর নমিনেশন পেতে হবে না। শেখ সাহেব চান প্রত্যেক লোক তাঁর আলোকে পথ চলবে। তিনি যখন ইচ্ছা আলো

www.pathagar.com

সরিয়ে নিলে সে লোক অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে। আপনি নিজের আলোকে চলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এ ধৃষ্টতা তিনি সহ্য করতে রাজী নন। আপনি এ যাবৎ আওয়ামী লীগের জন্য যতকিছুই করে থাকুন না কেন এরপর আর কখনো আপনি নমিনেশন পাবেন না। সত্যিই তাই ঘটেছিল। এলাকায় এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ভদ্রলোককে তিয়াত্তরের নির্বাচনে নমিনেশন দেওয়া হয়নি। দোহার-নওয়াবগঞ্জ এলাকার এম,এন,এ অতীব জনপ্রিয় জননেতা আশ্রাফ আলী চৌধুরী সত্তরের নির্বাচনে শেখ সাহেবের চাইতেও বেশী ভোট পেয়েছিলেন। প্রায় দুই লক্ষ ভোট পেয়ে যে লোকটি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাকেও বাহাত্তরের নির্বাচনে নমিনেশন দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারটা সেদিন সমগ্র রাজনৈতিক মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। শেখ সাহেবের চাইতেও বেশী ভোট পাওয়াটা ভদ্রলোকের জন্য কাল হয়েছিল।

তাই বলছিলাম এত বিপরীতধর্মী ভাবধারা বা অনুভূতির সমাবেশ একজনের মধ্যে হয় কি করে? এক কলসী দুধের মধ্যে এক ফোটা চোনা যেরূপ মারাত্মক কুফলের সৃষ্টি করে আমাদের ভাগ্যেও বোধ হয় তাই হয়েছে। এরূপ বিরাট একটা পুরুষের মধ্যে এরূপ সামান্য একটি কীট আমাদের সমস্ত মঙ্গল প্রচেষ্টাকেই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

আমাদের সাফল্যে নিয়তির প্রভাব

কোলকাতায় থাকার সময় বহুদিন আমি পঁচিশে মার্চ থেকে কোলকাতায় পৌঁছানো ও পরবর্তীকালের ঘটনাবলী যখন মনে মনে বিশ্লেষণ করেছি তখন আমার মনে হতো নিয়তি আমাদেরকে জয়ের দিকে আপনাআপনি ঠেলে দিচ্ছিল। প্রথম থেকেই নিয়তি এমন কতকগুলো পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল যেগুলোর উপর আমাদের নিজের কোন হাত ছিল না। এ সমস্ত ঘটনার একটি না ঘটলেই কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সুযোগ হতো না। প্রথমত, সত্তরের নভেম্বরে নোয়াখালির প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস যার কারণে ভাসানী সাহেব হঠাৎ নির্বাচন বর্জন ঘোষণা করলেন। যদি জলোচ্ছ্বাস

www.pathagar.com

না হতো আর ভাসানী সাহেব নির্বাচন করতেন তবে কমপক্ষে সাত-আটটি সীট তার দল পেয়ে যেত। তা হলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলেও আওয়ামী লীগের যে দু'তিনটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তা আর থাকতো না। ফলে ইয়াহিয়া মার্চের পহেলা তারিখের অধিবেশন বাতিল করতো না। এতে পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটবারও অবকাশ হতো কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, ঐ ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই ইয়াহিয়া খান চীন থেকে ইসলামাবাদে যাওয়ার পথে ঝড়বিধ্বস্ত এলাকা না দেখে সোজা চলে যাওয়ায় পাক সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রতি অবজ্ঞা ও হৃদয়হীনতার যে উদাহরণ তুলে ধরে দেশবাসীকে উত্তেজিত করতে শেখ সাহেব সক্ষম হয়েছিলেন তারও সুযোগ ঘটতো না।

তৃতীয়ত, সত্তর-একাত্তর সনে শেখ সাহেব ছাড়া ফজলুল হক বা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর কোন নেতাই মাঠে ছিলেন না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন জীবিত থাকলে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ একাত্তরের প্রথম দিকে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার প্রশ্নে যে স্থানে ঠেলে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সেভাবে পারতো কিনা সন্দেহ। তেসরা মার্চ পল্টন মাঠে ও তেইশে মার্চ বত্রিশ নম্বরে স্বাধীন বাংলার পতাকা মেনে নিতে শেখ সাহেবকে ছাত্রলীগের নেতারা বাধ্য করেছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব জীবিত থাকলে এটা আদৌ সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। পাক সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারদের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে ঐ স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলন যে বেশ কিছুটা কাজ করেছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। চতুর্থত, হিন্দুদের মেরে তাড়িয়ে দিয়ে পশ্চিম বঙ্গে দাঙ্গা সংগঠিত করাবার ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা আর একটি মারাত্মক ভুল হয়েছিল। হিন্দুদের মেরে না তাড়ালে যত হিন্দু সীমান্ত অতিক্রম করেছিল তার এক-দশমাংশ যেত কিনা সন্দেহ। আর তারা না গেলে শরণার্থীদের উপলক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপের সপক্ষে বিশ্ব জনমতও সৃষ্টি করা মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সম্ভব হতো না। এসমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার প্রায়ই মনে হতো

www.pathagar.com

স্বাধীনতা আমাদের কপালে লেখা ছিল, যেভাবেই হোক এটা আসতোই, শেখ সাহেব ছিলেন উপলক্ষ। তবে এ উপলক্ষ শত বৎসরে একবার আসে এও ঠিক।

একই রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে আমাদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করছিল তাতে তাদের সঙ্গে যে একসঙ্গে বেশী দেন থাকা চলবে না সেটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। জনসংখ্যায় আমরা অধিক হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন ও দেশ শাসনের উপর আমাদের কোন অধিকার ছিল না। স্বাভাবিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ অধিকার পাওয়ারও ভবিষ্যতে তেমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'দিন আগে-পরে স্বাধীন আমাদের হতেই হতো।

তাই বলছি স্বাধীনতা আসতোই, তবে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে স্বাধীনতাটা আট-দশ বছর আগে এসে গেছে। স্বাধীনতার জন্যে মনেপ্রাণে চরিত্রের দিক থেকে উপযুক্ত হওয়ার আগেই আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। স্বাধীনতাকে উপযুক্তভাবে ধারণ করার ক্ষমতা অর্জনের পূর্বেই স্বাধীনতা এসে গেছে। এটা অনেকটা পাঁচ বছরের ছেলের হাতে ছুরি পড়ার মত। ছুরি একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, এ দিয়ে অনেক কাজ হয়। কিন্তু সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য বয়স অন্তত দশ-বার বছর হতে হবে। না হলে অবোধ শিশুর হাতে ছুরি পড়লে নিজের নাক কান গলা কেটে মহা অনর্থ ঘটিয়ে বসে। বাষট্টি সালের পর থেকে আমাদের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনায় যোগ্য অল্প কিছু লোক সৃষ্টি হচ্ছিল। এদেশের প্রশাসনে অবাঙ্গালী অফিসার ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে কমে গিয়ে বাঙ্গালী অফিসারদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এভাবে প্রশাসনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে বাঙ্গালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে হতে এমন একটা সময় আসতো যখন জাতিগত বৈষম্য ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব

www.pathagar.com

ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকতো। ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের উঠতি পুঁজিপতিদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ক্রমাগত তীব্রতর হতে হতে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো যখন অবাঙ্গালীরা তাদের অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কলকারখানা ধীরে ধীরে বিক্রি করে দিয়ে তাদের অধিকাংশ পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করতো। এটা হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের জন্য মঙ্গল হতো। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পুঁজির বিকাশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি স্থানান্তর স্বাভাবিকভাবে ও সময়ের প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে যদি ঘটতো তবে পূর্বাঞ্চল একদিন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলেও আজ শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে অরাজকতা দেখছি এটা ঘটতো না। বর্তমানে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর নামে যে দেশপ্রেমহীন লুটেরা গোষ্ঠী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাঁকিয়ে বসেছে এদেরকে দেখতে পেতাম না। সেস্থলে দেখতে পেতাম দেশপ্রেমিক জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একটি শিল্পগোষ্ঠী যারা দেশের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতো। একাত্তরের যুদ্ধের পর পশ্চিমারা তাদের শত শত কোটি টাকার বিশেষ সম্পত্তি কলকারখানা ফেলে পালিয়ে যাওয়ার ফলে এগুলো গিয়ে পড়লো এমন সব লোকের হাতে যাদের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তো ছিলই না বরং এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নিঃস্ব, দালাল ও টাউট। ফলে গত পনর-ষোল বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সত্যিকার চরিত্রবান তেমন কোন ব্যবসায়ী বা শিল্পগোষ্ঠীর আগমন জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে বর্তমানে চলছে স্রেফ লুটপাট যা জাতীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিয়ে সামাজিক জীবনে সৃষ্টি করছে অনন্ত সমস্যা।

ষাট দশকের প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বোঝা মনে করে আসছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের পাটের টাকায় শিল্পায়িত হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে পাটের বিকল্প বের হওয়ার পর পাটের

www.pathagar.com

গুরুত্ব আন্তর্জাতিকভাবে অনেকটা কমে যায় এবং ইতিমধ্যে গোলাম মোহাম্মদ ব্যারেইজ, তারবেলা বাঁধ প্রভৃতি হওয়ার পর পাশ্চিম পাকিস্তান শিল্প ও কৃষিতে প্রভূত উন্নতি করে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছিল। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা নিজেদেরকে অনেক বেশী স্বাবলম্বী ভেবে আমাদেরকে লায়াবিলিটি মনে করতে লাগল। উনিশ'শ চৌষট্টি সনের মাঝামাঝি মতিঝিল আমিন কোর্টের নীচ তলায় মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেকটর ছিলেন আমানুল্লা খান নামে এক ভদ্রলোক। তিনি ডঃ কামাল হোসেনের ভায়রা ভাই হতেন। একদিন মনে আছে তার অফিসে বসে রাজনৈতিক আলোচনা করতে করতে পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক শোষণের কথা উঠতেই আমানুল্লাহ খান বললেন, "Mr. Mohaimen you do not know. Today West Pakistan thinks East Pakistan is liability to them. They like to get rid of you." শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমার ধারণা পাকিস্তান এখনো আমাদের পাটের টাকায় চলছে, তাই উষ্মার সঙ্গে আমি বললাম, "What stops you to get rid us? আমানুল্লা খান তখন বললেন, "East Pakistan is serving as a bondage between different states. If East Pakistan is allowed to get separated, then all the other states will clamour for seperation and Pakistan will vanish. So to keep Pakistan united you will be kept together if necessary by force."

এ অলোচনার সময় অন্য কারা তখন উপস্থিত ছিল এতদিন পরে মনে নেই তবে সংবাদের ম্যানেজার নাসির ভাই উপস্থিত ছিলেন এটা স্পষ্ট মনে আছে। বছর দুই আগে নাসির ভাই মারা গেছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে এই আলোচনার কথা তাকে আমি স্মরণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি স্বীকার করেছিলেন তার মনে আছে। আমানুল্লা খানের কথা যে কতটুকু সত্য সেটা টের পেয়েছিলাম স্বাধীনতার পরে যখন দেখলাম ছ'মাসের মধ্যে আমাদের দু'বার ডিভ্যালুয়েশন করতে হলো এবং পাকিস্তান মাত্র একবার

www.pathagar.com

ডিভ্যালুয়েশন করলো। এখন আমাদের টাকায় ডলারের দাম পঁয়ত্রিশ টাকা আর তাদের হলো ষোল-সতর টাকা। তাদের বাৎসরিক বিদেশী মুদ্রার আয় আমাদের দ্বিগুণেরও বেশী। আমানুল্লা সাহেবের মন্তব্য-- যে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদেরকে বোঝা মনে করে আমাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল এ সম্পর্কে আর একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম কয়েক বছর আগে এককালের যুবলীগের সেক্রেটারী মরহুম মোহাম্মদ সুলতানের একটি স্মরণ সভা উপলক্ষে। কথায় কথায় আমানুল্লা খানের এই মন্তব্যের কথা উঠলে অ্যাডভোকেট গাজিউল হক ষাট দশকের প্রথম দিকে তার এক. অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, বাষট্টি সনের দিকে আইয়ুব খান মওলানা ভাসানীকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "মওলানা সাব, হিঁয়া দো চার জেনারেল ইস্ট পাকিস্তান কো কাশ্মির কা সাথ ইকুয়েশন করনে মাংতা। আপ আঁকে ইনলোগ কো সমজাইয়ে।"

অ্যাডভোকেট গাজিউল হক তখন মওলানা ভাসানীর সেক্রেটারী ছিলেন। তাই তার হাতের ভিতর দিয়ে এই পত্র যাওয়ার সময় চিঠির বিষয়বস্তু তিনি জানতে পেরেছিলেন। কিছুদিন পরে মওলানা ভাসানী এই পত্রের জওয়াব দিয়েছিলেন যেটা গাজিউল হকের হাতের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল বলে উত্তরটা দেখারও সুযোগ তার হয়েছিল। মওলানা ভাসানী তাতে লিখেছিলেন, "খান ছাব, ইয়ে আপ কা মামলা হ্যায়, আপ ইছকো সামালিয়ে। মাঁয় ইছমে দাখেল হোনে নেহি চাঁতে হুঁয়"। অনেকেরই বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে ষাট দশকের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলার সঙ্গে কাশ্মির-এর বিনিময় করে পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে বলে বাজারে একটা গুজব রটে গিয়েছিল। এ গুজবের পেছনে সত্যতা কতটুকু ছিল সেটা সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এ গুজব থেকে ষাট দশকের প্রথম থেকে অখন্ড পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক কমে গিয়ে রাজনৈতিক গুরুত্বই যে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানীর কাছে আমরা সম্পদের চাইতে লায়াবিলিটি বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম এ ধারণাটার আঁচ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ যখন

www.pathagar.com

স্বাধীন হয় তখন আমাদের অনেকেরই ধারণা ছিল বাংলাদেশের পাট ও অন্যান্য সম্পদ হারাবার ফলে এবার পাকিস্তানের অর্থনীতি হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু পরবর্তীতে ফলাফল দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের মুদ্রামান আমাদের মুদ্রার দ্বিগুণ হয়ে গেল। সত্তরের নির্বাচনের সময় "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" এ মর্মে যে পোস্টার ছাপিয়ে দেশব্যাপী হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়ে নির্বাচনী রায় আমাদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম সেটা যে কতটা বাস্তবতাবর্জিত ছিল এটা সে সময় বুঝতে পারিনি।

বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে দেশ স্বাধীন

নভেম্বরের মাঝামাঝি মুক্তিবাহিনীর যুবকদের সাফল্য আমাদের মনে বেশ আশার সঞ্চার করলো। আমাদের মুক্তির দিন যে দ্রুত ঘনিয়ে আসছে এটা বেশ বুঝতে পারলাম। ছাব্বিশে অক্টোবর মিসেস গান্ধী উনিশ দিনের জন্য আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে ঘুরে এসে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বজনমতকে বুঝাতে পেরেছেন বলে মত প্রকাশ করলেন। এতদিন যেসব রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আশা করছিলেন যে পাকিস্তান একটা রাজনৈতিক সমাধান করতে রাজি হবে তারাও বুঝতে পারলো পাকিস্তানে রাজনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে এখন আর শেখকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সমাধানে আসতে গেলে সেনাবাহিনীর পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগ করা ছাড়া সম্ভব নয় যেটা করতে তারা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তাই যুদ্ধ অনিবার্য।

এ সময়ে একদিন তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার থিয়েটার রোডের বাড়িতে কথা হচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যেই মুখ্যত আমাদের মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছে। কিন্তু বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে দেশ দখল এটা আমার মনঃপূত হচ্ছিল না। আমি তাজউদ্দিন সাহেবকে বললাম বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে দেশ দখল কি আমাদের জন্য

www.pathagar.com

বুদ্ধিমানের কাজ হবে? ভারতের ইতিহাস আপনার জানা আছে। পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করার জন্য জয়চাঁন মহম্মদ ঘোরীকে ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর মহম্মদ ঘোরী আর ফিরে যাননি। আমার কথা শুনে তাজউদ্দিন সাহেব খানিকটা চুপ করে থেকে লোহার আলমারী খুলে একটা দলিল বের করে আমাকে দেখালেন। পড়ে দেখলাম একটি স্ট্যাম্প পেপারের উপর ইংরেজীতে কয়েকটি শর্ত লেখা রয়েছে। তার একদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দিন সাহেব স্বাক্ষর করেছেন অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর দিয়েছেন। শর্তগুলিতে লেখা আছে বাংলাদেশের যেসব অধিবাসী শুধু পঁচিশে মার্চ '৭১-এর পরে ভারতে প্রবেশ করেছে শুধু তারাই দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশে ফিরতে পারবে অন্যেরা নয়--অর্থাৎ এর আগে যারা এসেছে তারা পারবে না।

আর একটি শর্তে পরিস্কার লেখা রয়েছে যে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে ঢুকতে পারবে না এবং বাংলাদেশ সরকার যতদিন চাইবে শুধু ততদিনই ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে থাকতে পারবে। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে বললেন গত কয়েক মাস ধরে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করে আমার যতটুকু ধারণা হয়েছে তাতে এই মহীয়সী কথার বরখেলাপ করবেন না। আপনার কথার মধ্যে মোহাইমেন সাহেব সত্যতা অনেকটা আছে। বিদেশী সৈন্যদের নিজের দেশে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে বিপদ অনেক আছে এটা আমি বুঝি কিন্তু আমার অবস্থা হচ্ছে "ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির", আরো বছর দু'এক অপেক্ষা করে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গড়ে দেশ দখলের জন্য বিলম্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমত এত শরণার্থীর বোঝা ভারত আর অধিক দিন বইতে পারছে না। এখনই ইন্দিরা কংগ্রেস বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনার মুখে বিব্রতবোধ করছে। সহসা এর সমাধান করতে না পারলে আগামী বছরের প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করা মিসেস গান্ধীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাই যথাসম্ভব শীঘ্র বিদেশী সৈন্যের সাহায্য নিয়ে হলেও আমাকে দেশে ঢুকতে হবে।

www.pathagar.com

আমি তখন বললাম যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে মাত্র আট মাস হলো। সংগ্রাম দীর্ঘকাল না চললে মেকি নেতৃত্বের অবসান ঘটে খাঁটি নেতৃত্ব সামনে আসার সুযোগ পায় না। কারা খাঁটি ও উপযুক্ত আর কারা মেকি ও অনুপযুক্ত এটা পরিষ্কার হয়ে নেতৃত্বে পরিচ্ছন্নতা আসার জন্য সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি? তাজউদ্দিন সাহেব উত্তর দিলেন এ ব্যাপারেও আমি আপনার সংগে একমত। যুদ্ধ একটা অগ্নিপরীক্ষার মতো। যুদ্ধের সময় সব নেতাকেই আগে-পরে এর মধ্য দিয়েই যেতে হয়। তখন খাঁটি যারা তারাই টিকে থাকে আর মেকিরা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু বিলম্ব করার আমার সময় নেই কারণ দেশ থেকে আমি যে খবর পাচ্ছি সেটা ভয়াবহ। হানাদার বাহিনী পরিকল্পনা নিয়েছে দেশের আঠার বছর থেকে চল্লিশ বছরের সব যুবককেই মেরে ফেলবে যাতে জয়বাংলা শ্লোগানে উজ্জীবিত কোন যুবক দেশে আর না থাকে। তারা বলেছে 'মিট্টি চাহিয়ে, আদমী নেহি চাহিয়ে'। তাই যে পরিকল্পনা তারা নিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে যথাশীঘ্র দেশে যেতে হবে। বিদেশী সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে যাওয়ার মধ্যে রিস্ক্ আছে কিন্তু সে রিস্ক্ না নিয়ে আমার উপায় নেই। এত স্বল্প সময়ে দেশ স্বাধীন হওয়ায় এবং পার্টিতে এত অধিক মেকি নেতার অবস্থিতি ভবিষ্যতে যে কিরূপ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে সেটা আন্দাজ করে আমি মনে মনে আতঙ্কিত বোধ করছিলাম এবং স্বাধীনতার পরে নেতৃত্বের কোন্দল ও অনেকের মূল্যবোধহীনতা আমার সে আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করেছিল।

এ ছাড়া আরও একটি বিষয় সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। সেটা হলো ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলীর একটি গোপন ফাইল ভারত সরকারের হাতে অর্পণ করা। প্রত্যেক দেশের বিদেশস্থ কূটনৈতিক দূতাবাসের সঙ্গে যে দেশে দূতাবাসটি অবস্থিত সে দেশের কিছু লোকের গোপন যোগাযোগ থাকে যাদের মারফৎ সে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অনেক ক্ষেত্রে সামরিক সত্যিকার তথ্য উক্ত দূতাবাস সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। অপর দেশের সত্যিকার অবস্থা জেনে তদনুযায়ী নীতি নির্ধারণের এ

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা সব রাষ্ট্রই করে থাকে এবং সব রাষ্ট্রেরই সকল বিদেশী দূতাবাসে একটি ফাইলে উক্ত দেশের গোপন সংযোগকারীদের নাম লেখা থাকে। কোন রাষ্ট্রে সরকার পরিবর্তন যতবারই হোক না কেন এ দূতাবাসের যত কর্মচারীই আনুগত্য পরিবর্তন করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন এ ফাইলের তথ্য কোন দিনই ফাঁস করা হয় না। হোসেন আলী সাহেব যখন আনুগত্য পরিবর্তন করেন তখন পাকিস্তান আমলের এই ফাইলটি ভারত সরকারের হাতে অর্পণ করে খুব গর্হিত কাজ করেছিলেন বলে আমি মনে করি। এর ফলে সৈয়দ বদরুদ্দোজাসহ পশ্চিম বঙ্গের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোককে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। তাজউদ্দিন সাহেব প্রথমে হোসেন আলীর কাজকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন বললাম রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা স্থায়ী মিত্র বলে কেউ নেই। আজ ভারতের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বিশ বছর পরও এমনি থাকবে তার গ্যারান্টি কি? স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের দূতাবাস যখন এখানে থাকবে তখন এখানকার খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা আমরা কি করব না? হোসেন আলী সাহেব অতিরিক্ত ভারতপ্রীতি দেখাতে গিয়ে যে কাজটি করলেন এর ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ ভবিষ্যতে এখানে কেন অন্য কোন রাষ্ট্রেও সিক্রেট এজেন্ট বা বন্ধুভাবাপন্ন কোন লোকের সাহায্যই আর সহজে পাবে না। কোন দেশের লোকই আর বাংলাদেশ দূতাবাসকে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে বিশ্বাস করবে না। আমার এ মন্তব্যে তাজউদ্দিন সাহেব খুব বিব্রতবোধ করেছিলেন, কোন উত্তর দিতে পারেননি।

৬ই ডিসেম্বর সরকারীভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হলেও বলতে গেলে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বর্ডারের কাছে বেশকিছু অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছিল। হানাদার বাহিনী বর্ডারের অনেক চেকপোস্ট ত্যাগ করে সীমান্তের শহরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদিন প্রথমে গাড়ীতে পরে সীমান্তবর্তী একটি নদী লঞ্চে অতিক্রম করে খুলনার দেবহাটা থানা হেডকোয়ার্টারে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হলো।

www.pathagar.com

কলিকাতা থেকে সেখানে পৌঁছতে ঘন্টা তিনেক লাগলো। শীতের প্রারম্ভ, মিঠে মিঠে রোদে ভ্রমণ বেশ আনন্দদায়ক হয়েছিল। সেখানে একটা বিরাট দীঘির শানবাঁধানো ঘাটে আমরা বসলাম। সঙ্গে বড় বড় ফ্লাস্কে গরম চা আনা হয়েছিল। খুব আরাম করে বিকেলে চা-নাস্তা খেলাম। আমার নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিচ্ছি ভাবতেই মনটা কি একটা স্বর্গীয় আনন্দে ভরে গেল। কতকাল পরে দেশের মাটিতে পা রাখতে পেরেছি ভাবতেই মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। কয়েকজন বুড়ো লোক আমাদেরকে দেখে এগিয়ে এলেন। তাঁদের কাছে শুনলাম হানাদার বাহিনী সপ্তাহখানেক পূর্বে একদিন রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে। দুই-তিনশ সৈন্য এখানে ছিল। কিন্তু ভোরবেলা দেখা গেল কেউ নেই। সেখান থেকে আমরা একটি মাঠে গেলাম, কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটি গেরিলা বাহিনী এসে আমাদের সামনে ঘুরে ঘুরে মার্চ করতে লাগলো। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মেজর জলিল। মেজর জলিলের নাম আমি পূর্বে শুনেছিলাম কিন্তু চোখে দেখিনি। আজ দেখলাম গোঁফ-দাড়িমণ্ডিত এক শক্ত-সমর্থ জোয়ান পুরুষ। ইনি মুক্তিযুদ্ধে খুলনা-যশোহর অঞ্চলে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধশেষে বাংলাদেশ থেকে পাক বাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্র ভারতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের চাপে বাংলাদেশ সরকারের আদেশে তাকে গ্রেফতার করে জেলে রেখে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ইনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হয়েছিলেন। কৃষকদের সংগে আলাপ করে জানলাম সে বছর অনুকূল আবহাওয়ার কারণে আমন ধানের প্রচুর ফলন হয়েছে। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু হলুদ ধানের ক্ষেত। রাত প্রায় নয়টার দিকে কোলকাতা চলে এলাম।

যুদ্ধ আরম্ভ

৬ই ডিসেম্বর সকালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের তরফ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। ৩ তারিখ সন্ধ্যায় যখন জানা গেল পাকিস্তান বিমান

www.pathagar.com

বাহিনী ভারতীয় এলাকায় আক্রমণের ভিতর দিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ করেছে তখনই বুঝেছিলাম দুই-একদিনের মধ্যে আমাদের সরকার স্বীকৃতি পাচ্ছে। বেলা ১০টার দিকে বাংলাদেশ মিশনে গেলাম ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণের প্রতিক্রিয়া ও যুদ্ধের শেষ ফলাফল জানবার জন্যে। মিশনে গিয়ে দেখি এলাহি কারবার। চারদিক থেকে ঢাক-ঢোলসহ মিছিলের পর মিছিল আসছে। যুবক-যুবতীর অধিকাংশেরই হাতে ফুল। ছেলেরা মেয়েরা কেউ কেউ হাত ধরাধরি করে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে আসছে। অনেকেরই চোখে আনন্দাশ্রু, মিশনের চত্বর লোকে লোকারণ্য। কেউ কেউ খুশিতে আনন্দে হাসছে। অধিকাংশই আনন্দের আতিশয্যে নীরবে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। এরা সবাই কোলকাতার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং শতকরা নিরানব্বই জনই বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী ও হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। একপুরুষ আগে এরা সবাই পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী ছিল। এদের সবারই চোখেমুখে এমন একটা পবিত্রতার স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটে বের হচ্ছিল যা দেখে আমি অবাক বিস্ময়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলাম।

কোন অবস্থাতেই আমার চোখে সহজে পানি আসে না। নিজের সচেতন মনে গত ৪০ বছরের জীবনে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে একবার কি দু'বারের বেশী কেঁদেছি কিনা সন্দেহ কিন্তু সেদিন মিশনের সামনের চত্বরে যে অভাবিতপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার চোখ পানিতে ভরে গেল। নিজের অজ্ঞাতে হাত দিয়ে চোখ মুছে ফেলে মিশনের সিঁড়িতে নিঃশব্দে বসে পড়লাম। মন একদিকে আনন্দে ভরপুর, অন্যদিকে কি একটা অব্যক্ত বেদনায় মন আমার পাথরের মত ভারি হয়ে গেল। এর মধ্যে কোথা থেকে থালায় থালায় মিষ্টি এসে গেল। চারদিকে মিষ্টি বিলি হতে লাগল। সবাই দিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য আগ্রহ সহকারে মিষ্টি খেতে আরম্ভ করল। আমাকেও মিষ্টি খাওয়ার জন্য অনেকেই অনুরোধ জানাল, কিন্তু আমি রাজী হলাম না। অনেকেই বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকাল। পরিচিত দু'চারজন আমাকে জিজ্ঞেস করল এ আনন্দময় দিনে আমি মিষ্টি খেতে চাচ্ছি না কেন? আমার মুখই বা এত শুষ্ক

www.pathagar.com

কেন? আমার মনে তখন যে চিন্তা ও দুঃখের ঝড় বইছিল তা কাউকে বলবার নয়। আমি আনন্দাশ্রুতে ভেসে যাওয়া সামনের নরনারীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম এরা আজ যে স্বর্গীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বলগ্নে অশ্রু, নিঃস্বার্থ প্রেম, শুভেচ্ছা ও ভালবাসার ভেতর দিয়ে এ নতুন রাষ্ট্রের জন্মকে আহ্বান জানাচ্ছে তা কতদিন স্থায়ী হবে?

এর আগে আমি বলেছি মরহুম রবিউদ্দিনের বাসায় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কোলকাতার বুদ্ধিজীবীদের যেসব সভা-সমিতি হতো তাতে লক্ষ্য করতাম উপস্থিত অনেকের মনে একটা গোপন আকাঙ্খা রয়েছে - এতো দিনে বাংগালীদের একটা নিজস্ব রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে, যে রাষ্ট্র হবে তাদের একান্ত আপনার। পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের সব বাঙ্গালীরাই হবে এর মালিক, এর বাসিন্দা ও নাগরিক। নতুন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর বাস্তবতার আঘাতে যখন এ ধারণা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে এরা তখন মানসিক দিক থেকে কতবড় আঘাত পাবে সেই কথা ভেবেই মন আমার বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বাংলাদেশ মিশনের সিঁড়িতে বসে ঠিক একথা ভাবছিলাম আমি। সমগ্র ভারতের অবাঙ্গালী হিন্দুদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের চাপে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছিল। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তাদের মান-মর্যাদা ক্ষীণ। তাই বাঙ্গালীদের একটা আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে এই আনন্দে এই মুহূর্তে তারা আত্মহারা। এই নতুন রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীদের সঙ্গে যে কোনকালে তাদের স্বার্থের সংঘাত হতে পারে এ কথা তারা এই মুহূর্তে ভাবতেই পারছে না। এই মুহূর্তে যে তারা বাঙ্গালীদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় আনন্দে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে তাতে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নেই, স্বার্থপরতার স্পর্শ নেই। বহুদিন পরে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত নিপীড়িত বাঙ্গালী জাতি আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে এ সুখময় অনুভূতিতে সবাই আত্মহারা। আমি কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র। একটি রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে মানুষের এ অনুভূতি এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে

www.pathagar.com

জাগতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব কিভাবে সেই একই মানুষগুলির ঐক্য, স্বদেশপ্রেম ও অপার্থিব অনুভূতিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয় তার অনেক নজির আমি ইতিহাসে দেখেছি। তাই ৬ই ডিসেম্বরে অন্যদেরকে ভাবাবেগের জোয়ার যতটা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে ততটা পারেনি। দুপুরে বাসায় ফেরার পর আমাকে প্রতিবেশী কয়েকজন অভিনন্দন জানাতে এসে মিষ্টি খাওয়াতে বলল। অনেক পীড়াপীড়িতে মিষ্টি আনিয়ে সবাইকে খাওয়ালাম কিন্তু নিজে আমি কিছুতেই খেতে পারলাম না। সীমান্তের ওপারের বাঙ্গালীদের বাংলাদেশের প্রতি এর প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে এবং প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক মাস পর পর্যন্তও যে প্রীতি, মমতা ও শুভেচ্ছা দেখেছি তা ভুলবার নয়।

আমার মনে পড়ে '৭২ সালের ডিসেম্বরে আমি আজমীর গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জয়পুর আসার পথে ট্যাক্সিতে দুটি বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তারা জয়পুরে সরকারী অফিসে চাকরি করছিল, আমি বাংলাদেশের লোক শুনে তারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়গান করতে লাগল, ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়ে সমগ্র ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের কাছে বাঙ্গালীদের মান-মর্যাদা যে কত বাড়িয়ে দিয়েছি পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করতে লাগল। আমাকে বলল, দাদা আপনারা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র ভারতে আমাদের সম্মান কতটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন তা জানেন না। এতদিন এই মেড়োরা, পাঞ্জাবিরা, মারাঠিরা আমাদের মানুষই মনে করত না। অত্যন্ত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমাদের সাথে ব্যবহার করত। এবার তাদের আমরা বলি, দেখ্ বাঙ্গালীদের সাহস ও শৌর্যবীর্য। তারা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র বানিয়েছে যেটা তোরা আজও পারিসনি। সত্যি দাদা আপনাদের সাফল্যে আমরাও গর্বিত। এখন আমরা সবখানে বুক ফুলিয়ে চলি। আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে ভারতের এক প্রান্তে পড়ে আছি, প্রতিদিন আপনাদের নতুন রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আপনাদের দেশের অবস্থা এখন কেমন ..... যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে এখন তো উন্নতির দিকে বেশ এগিয়ে যাচ্ছেন তাই না? তখন '৭২ সনের শেষ, দেশে

www.pathagar.com

চারদিকে বিশৃংখলা, লুটপাট সমানে আরম্ভ হয়ে গেছে। জিনিসপত্রের দামের উর্ধ্বগতিতে মানুষ দিশেহারা, চল্লিশ টাকার চাল তখন সোয়াশ' দেড়শ' টাকা হয়ে গেছে। অস্ত্রের রাজনীতি পুরাদমে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। '৭১-এর সংগ্রামী মানুষগুলোর আশাভঙ্গের বেদনা আমার মনকে তখন কুরে কুরে খেতে আরম্ভ করেছে। আমি কি উত্তর দেব ঠিক করতে পারলাম না। দেশের সত্যিকার অবস্থার কথা বলে যুবকদ্বয়ের আশাদীপ্ত মুখের উজ্জ্বল হাসিটুকু ফু' দিয়ে নিবিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হল না। অস্পষ্টভাবে অনেকটা ধরা গলায় 'হাঁ কিছুটা যাচ্ছি' বলে ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

'৭২ সনের দু'বছর পর আবার কোলকাতা গিয়েছিলাম। '৭৪ সনে দেখলাম সেখানকার মানুষের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। '৭১ সনে সেখানে ট্রেনে-বাসে বাংলাদেশের লোক বললে টিকেট লাগতো না, সবখানেই জয়বাংলার দেশের লোক বলে একটা সম্মানিত ব্যবহার পাওয়া যেত। '৭৪ সনে দেখলাম সে সম্মান আর নেই। আমরা যে ঠিকমত দেশকে চালাতে পারছি না, নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি আরম্ভ করেছি, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের মত আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি, স্বাধীনতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে লুটপাটে মত্ত হয়ে পড়েছি, এখানকার বহু যুবক লুটলব্ধ প্রচুর অর্থ নিয়ে কোলকাতার বিভিন্ন হোটেলে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে, এ খবর সে দেশের লোকজন ইতিমধ্যে জেনে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেখানকার অনেকের অবাস্তব আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভের কারণ, বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে সেখানে নানা অপপ্রচার, যুদ্ধের সময় আমাদের যে সংগ্রামী চরিত্র তাদের মুগ্ধ করে বাঙ্গালী বলে আত্মপ্রসাদ লাভে সাহায্য করেছিল সেই গৌরবময় ভূমিকা থেকে আমাদের দুঃখজনক বিচ্যুতি- এসমস্ত কারণ মিলিয়ে আমাদেরকে তাদের কাছে অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র করে তুলেছিল। সেখানকার অনেকেরই মুখে-চোখে এরকম তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে মনে মনে গভীরভাবে আহত হয়েছিলাম।

www.pathagar.com

সেদিনও আমার ৬ই ডিসেম্বরের কথা মনে পড়ে বুক থেকে অজান্তে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল।

যাহোক ৬ই ডিসেম্বরের পর রোজই রেডিওতে নতুন নতুন বিজয়ের খবরে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। বাংলাদেশ বাহিনী মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় যেভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল তাতে অল্প কয়েক দিনেই যে ঢাকার পতন হবে এ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম। তবে ঢাকায় চূড়ান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হলে আমাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। এরমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ করে যুদ্ধবিরতি ঘটাবার জন্য আমেরিকা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু রাশিয়ার তিন-তিনবার ভেটো দেওয়ার ফলে আমেরিকার কোন প্রচেষ্টাই সফল হলো না। যুদ্ধবিরতি হলেই এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হতো এবং আমরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতাম। এদিকে শুনলাম চীন তার বন্ধু পাকিস্তানকে সাহায্যের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ করার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছিল। শোনা গেল উত্তর সীমান্তে চীনা বাহিনীর একাংশের চলাচল আরম্ভ হয়েছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় চীনা বাহিনীর নড়াচড়া সামরিক মহড়াতেই শেষ হলো। খুব সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের পুরো আন্দোলনটাই জনগণের আন্দোলন এটা বুঝতে পেরে এবং প্রথম থেকে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ইয়াহিয়াকে চীনের চাপ দেওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া কথা না শোনায় বিরক্তিবশত চীন শেষ পর্যন্ত সামরিক হস্তক্ষেপে রাজী হলো না। যতদূর জানা যায় চীন এসময়ে একটা গভীর অভ্যন্তরীণ সংকটেরও সম্মুখীন হয়েছিল। চীনের সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা প্রধান মিঃ লিন-পিয়াও এর নেতৃত্বে এসময় একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যেটা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ায় লিন-পিয়াও নিজ পরিবার ও কয়েকজন সঙ্গিসহ একটি সামরিক বিমানে পলায়ন করতে গিয়ে মঙ্গোলিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার কারণে অনেকের ধারণা চীন পাক-ভারত সংঘর্ষের মত গুরুতর ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে রাজী হয়নি। চীন হস্তক্ষেপ করলেই আমেরিকার সপ্তম নৌবহর যেটা মালাক্কা প্রণালী দিয়ে দ্রুত ভারত

www.pathagar.com

মহাসাগরের দিকে এগিয়ে আসছিল সেটা তার বিশাল বিমানবাহী জাহাজগুলো থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে 'এয়ার আমব্রেলা' দিলে ভারতীয় বিমান বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তো। অবশ্য সোভিয়েত নৌবহরও সপ্তম নৌবহরের পিছু পিছু এসে ভারত মহাসাগারে উপস্থিত হয়েছিল এবং সপ্তম নৌবহর কোন হস্তক্ষেপ করতে গেলে সোভিয়েত নৌবহর কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা ঘটনা নিরীক্ষণ করতে লাগলাম।

যাক শেষ পর্যন্ত ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যখন জানতে পারলাম মিত্রবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে এবং দু'একদিনের মধ্যে ঢাকার পতন হবে, চীন-আমেরিকার পক্ষে বাধার সৃষ্টির আর সম্ভাবনা নাই তখন অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

৬ই ডিসেম্বর যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে পাক-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল তথাপি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকারে চলে এসেছিল। সীমান্ত এলাকার বড় বড় শহরগুলোতে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। এ ঘাঁটিগুলি প্রায় ছোটখাট দুর্গের মত অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাসখানেক প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার মত রসদ দ্বারা সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। তাদের খুব সম্ভব ধারণা ছিল লড়াই করে এসমস্ত সুরক্ষিত ঘাঁটি পর্যুদস্ত না করে ভারতীয় বাহিনী ঢাকা আক্রমণ করার জন্য এগুতে পারবে না। এসমস্ত ঘাঁটি পর্যুদস্ত করে অভ্যন্তরভাগে এগিয়ে যাওয়া যেহেতু বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হবে ততদিনে বিধ্বস্ত পাকবাহিনী রিগ্রুপিং করে ঢাকা প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলবার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাবে। ইতিমধ্যে তাদের বন্ধু চীন ও আমেরিকার সাহায্যে নিশ্চিতভাবে যুদ্ধবিরতি ঘটে স্থিতাবস্থা এসে যাবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে ঐ সমস্ত সুরক্ষিত দুর্গ পাশ কাটিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে জনসাধারণের সক্রিয় সহায়তায় ভারতীয় বাহিনী এত দ্রুতবেগে নদী-নালা পার হয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে এসে হাজির হতে পারবে। ভারতীয়

www.pathagar.com

চতুর ও বুদ্ধিমান সমরবিদরা পাকবাহিনীর রণকৌশল পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। অতিদ্রুত ঢাকার পতন ঘটিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে না পারলে যেকোন মুহূর্তে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে এ সচেতনতা থেকে সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলো পর্যুদস্ত করতে গিয়ে শক্তিক্ষয় না করে যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়াই তারা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বুঝতে পেরেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত সঠিক ও বিজ্ঞোচিত হয়েছিল পরবর্তী ঘটনায় তা ভালভাবে প্রমাণিত হয়। সীমান্তের শহরগুলিতে অবস্থানকারী পাক-সৈন্যবাহিনী যখন ভারতীয়দের এ কৌশল বুঝতে পেরেছিল তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। দ্রুত ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণ তাদের পক্ষে ছিল তখন প্রায় অসম্ভব। পশ্চাদপসরণ করতে গিয়ে একদিকে সপক্ষের বিমান বাহিনীর অভাব অন্যদিকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণে পশ্চাদপসরণকারী অধিকাংশ পাকবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল, ফলে ঢাকা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেওয়ারও তাদের অধিকাংশের পক্ষে আর সম্ভব হলো না। সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পরিকল্পনা না করে অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে চারদিকে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে ব্যূহ রচনা করে রাজধানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললে মেঘনা, ধলেশ্বরী, যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদীগুলির প্রাকৃতিক সাহায্যপ্রাপ্ত মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত এ বাহিনীকে পরাজিত করে ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হওয়া ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে আদৌ সম্ভব হতো কিনা সন্দেহের বিষয়। সামরিক ইতিহাসে ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে এটা ছিল একটা বিরাট কৌশলগত বিজয়।

এর মধ্যে ১৫ই ডিসেম্বর দুপুরের দিকে শুনতে পেলাম কয়েকশ বুদ্ধিজীবীকে নাকি ঢাকায় আলবদররা মেরে ফেলেছে। নিহতদের মধ্যে আমার পরিচিত বহু বন্ধুবান্ধবের নাম রয়েছে জানতে পারলাম। বিজয়ের ঠিক এই মুহূর্তে এইরূপ একটা পৈশাচিক ঘটনা ঘটতে পারে এটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। আমি এটাকে প্রথমে পুরো গুজবই মনে করেছিলাম কিন্তু পরদিন যখন পত্রিকায় দেখলাম এবং নিহতদের মধ্যে অনেকের নামও উল্লিখিত হলো তখন

www.pathagar.com

আর অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না। ভবিষ্যতে দেশ পুনর্গঠনের ব্যাপারে এই বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড কত বড় শূন্যতা সৃষ্টি করলো ভেবে দুশ্চিন্তায় মন ভরে গেল।

১৬ই ডিসেম্বর ভোরবেলায় শুনতে পেলাম ঐদিন দুপুরের পরে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজি তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। শুনে ছুটে গেলাম আট নং থিয়েটার রোডে তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ভাবলাম তিনি হয়তো এতক্ষণে ঢাকায় চলে গেছেন অথবা যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তাজউদ্দিন সাহেব স্বাভাবিক পোশাকে বসে আছেন। তিনি কখন যাবেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, তিনি যাবেন না। শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এতদিন পরে দেশ স্বাধীন হচ্ছে, শত্রুবাহিনী আত্মসমর্পণ করছে, এসময় প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই বোধগম্য হলো না। কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, "শেখ মনি ও মুজিব বাহিনীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো আপনার জানা আছে। সৈন্যবাহিনীতে আমার শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি এই মুহূর্তে ঢাকায় সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা চলছে। ঠিক এসময় ঢাকায় কোন জনসমাবেশের মধ্যে আমার উপস্থিত থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। জনতার ভীড়ের মধ্যে মুজিববাহিনীর লোকেরা যে কোন মুহূর্তে আমাকে গুলি করে হত্যা করে ফেলতে পারে কিন্তু দোষ চাপিয়ে দেবে আলবদর আলসামসের ঘাড়ে এবং লোকেরাও সেটা বিশ্বাস করবে, তাই আমার শুভাকাঙ্খীরা বলেছে ঢাকার অবস্থা মোটামুটি তাদের আয়ত্তে আসলে তারা আমাকে জানাবে এবং আমি আশা করি দু'এক দিনের মধ্যেই আমি যেতে পারব।" ওসমানী সাহেব যাচ্ছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন তিনিও যাচ্ছেন না। আমি বুঝলাম তাঁরও না যাওয়ার কারণ একই, যেহেতু মুজিব বাহিনী তাঁর প্রতিও অত্যন্ত বিরূপ ছিল। আমাদের তরফ থেকে কে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন সেটা এখনও ঠিক হয়নি। আত্মসমর্পণের মতো এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমাদের

www.pathagar.com

দিক থেকে নেতৃস্থানীয় কেউ প্রতিনিধিত্ব করছেন না শুনে ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক মনে হলো। এই অনুপস্থিতি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অবদান ও অবস্থানকে যে কতটা গুরুত্বহীন করে ফেলবে এটা ভেবেই মনটা দমে গেল। এখন লোকের চোখে মনে হবে ভারতীয় বাহিনীই সব, আমরা কেউ নই।

পরবর্তীকালেও দেখেছি ঐদিন তাজউদ্দিন সাহেবের বা বাংলাদেশ সরকারের ঢাকায় অনুপস্থিতি সাধারণ মানুষের কাছে খুব সমালোচনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকেরই ধারণা হয়েছিল সমস্ত কৃতিত্ব তাদের নেওয়ার জন্য ভারত সরকারই প্রবাসী সরকার ও জেনারেল ওসমানীকে ঢাকায় আসতে দেয়নি। স্বাধীনতাবিরোধীরা এ ব্যাপারটার সুযোগ পরবর্তীকালে ভালভাবেই নিয়েছিল। ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণার জন্য এটিও একটি ভাল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

যাক অবশেষে ঢাকায় আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর আয়ত্তে আসার পর ২২শে ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় আগমন করেন। ১৬ই ডিসেম্বরের পরে যথাশীঘ্র ঢাকায় ফিরে আসবার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও যানবাহনের অভাবে ২৪ তারিখের আগে আমি ঢাকায় ফিরতে পারলাম না। ২৪ তারিখ ভোরে অতিকষ্টে একটি মিলিটারী প্লেনে একটি আসন যোগাড় করে এ নয়মাস তারক দত্ত রোডের যে বাসায় ছিলাম সে বাসায় বন্ধু রফিক ও তার স্ত্রী মনসুরা বেগম লুসীকে এতদিনের সহৃদয় আতিথ্য ও আন্তরিক সেবাযত্নের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভারাক্রান্ত মনে দমদম বিমানবন্দরের পথে রওয়ানা হলাম। বন্ধু রফিক বিমানবন্দর অবধি আমার সঙ্গে এলো এবং অনেকক্ষণ পরে যখন বিমানে আরোহনের নির্দেশ এলো প্লেন না ছাড়া পর্যন্ত সজল চোখে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com